তিন গোয়েন্দা

জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

অদ্ভুত এক ছবিরহস্যের সমাধান করার জন্যে
জয়দেবপুরের এক অত্যাধুনিক ভেড়ার ফার্মে
আমন্ত্রণ জানানো হলো তিন গোয়েন্দাকে।
পার্চমেন্টের উপর আঁকা ছবিটা চারভাগ করা।
প্রথম ছবিটা একজন সুন্দরী মহিলার।
দ্বিতীয়টা একজন পুরুষের।
তৃতীয়টায় দেবদূতেরা একটা শিশুকে ধরে রেখেছে।
শেষ ছবিটায় একটা নৌযান দুর্ঘটনার দৃশ্য।
জটিল এই ছবিরহস্যের সমাধান করতে গিয়ে
হিমশিম খেতে হলো কিশোর পাশাকে।
একঝাঁক বিচিত্র ভয়ঙ্কর পাখি যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল
গায়ের উপর, দিশেহারা হয়ে পড়ল ওরা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

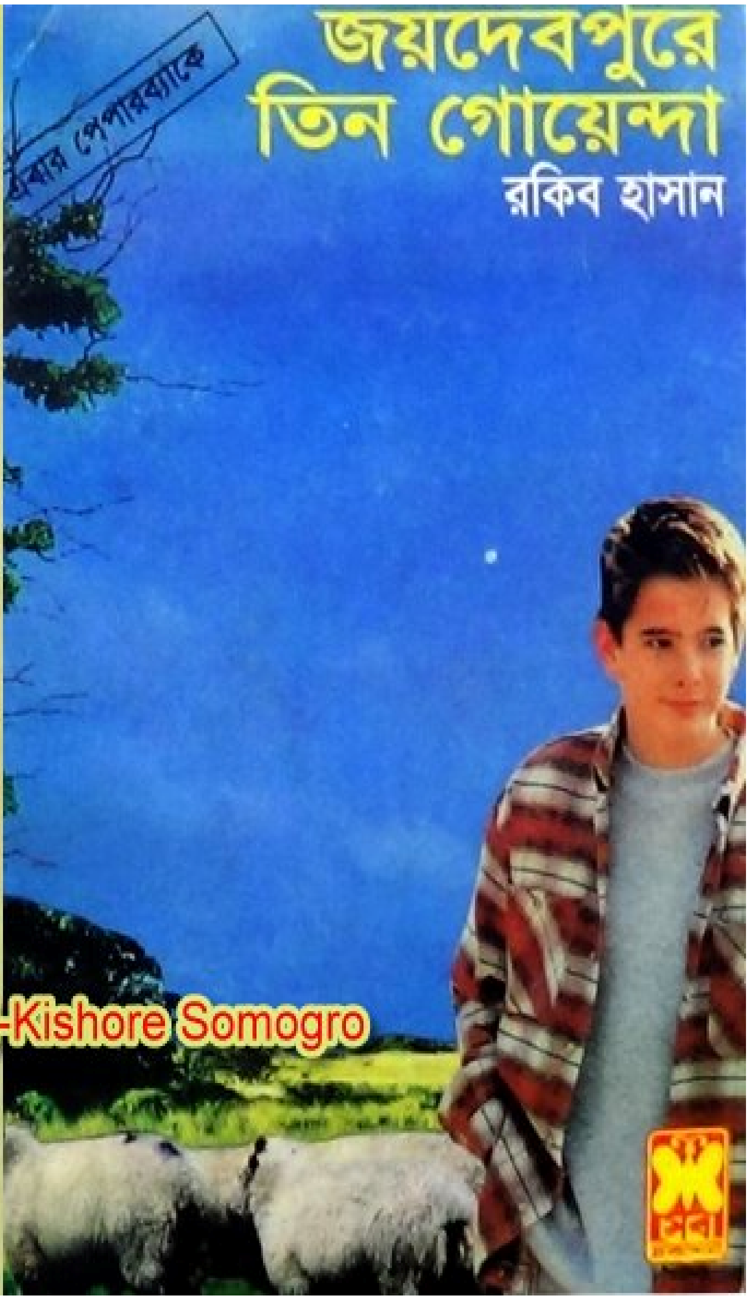

জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। জিনা আর রাফিয়ানও এসেছে। কিশোরের মামা অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি আরিফুর রহমান চৌধুরীর বাড়ির ড্রইংরুমে আড্ডা দিচ্ছে সবাই মিলে। এমন সময় কলিং বেল বাজল। কান খাড়া করে ফেলল রাফি। কিন্তু চোখ মেলল না। যে এসেছে, নিশ্চয় সে-লোকটা তার পরিচিত। সেজন্যেই সতর্ক হলো না।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল কিশোর।

ঘরে ঢুকল সেলিম শাহেদ। সঙ্গে এক সুদর্শন কিশোর। তিন গোয়েন্দার সমবয়েসী।

সেলিম পত্রিকার লোক। কিশোরের পরিচিত। হাসিমুখে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই। আমার ফুপাত ভাই, শাহরিয়ার খান কাজল। কাজল, এদেরকে নিশ্চয় চিনতে পারছ?'

'অবশ্যই,' হেসে কিশোরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল কাজল। 'তুমি কিশোর পাশা।' কিশোরের হাতটা চেপে ধরে রেখেই ফিরে তাকাল। 'তুমি রবিন। আর তুমি মুসা।' জিনার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তুমি জিনা।' তার পায়ের কাছে শুয়ে থাকা কুকুরটার দিকে তাকাল। 'কেমন আছিস, রাফি?'

এতক্ষণে চোখ মেলল রাফি। গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, 'খুফ! খুফ!' যেন কুকুরের ভাষায় বলতে চাইল, 'ভাল। তা তুমি বাবা ভাল তো?'

ওর ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল সবাই। রবিন আর মুসার সঙ্গে হাত মেলানো শেষে রাফির মাথা চাপড়ে আদর করে দিল কাজল।

সোফায় বসল সে আর সেলিম। সেলিমের হাতে বড় একটা প্যাকেট। সেটা জিনার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'তোমার জন্যে।'

অবাক ভঙ্গিতে হাতে নিল জিনা। 'কি?'

'খুলেই দেখো।'

সুদৃশ্য কাগজে মোড়া প্যাকেট। রঙিন সুতো দিয়ে বাঁধা। খুলতে শুরু করল জিনা। কৌতূহলী দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

ভেতর থেকে বেরোল চমৎকার একটা ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট। চোখ বড়

বড় হয়ে গেল জিনার। 'আরে, এত সুন্দর! সত্যি আমার জন্যে?'

মিটিমিটি হাসছে কাজল। মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। বাবা দিল তোমাকে দেয়ার জন্যে।'

'তোমার বাবা? আমাদের কথা তিনি জানলেন কি করে?'

'তিন গোয়েন্দা পড়ে।'

'মানে?'

'বুঝলে না? আমার মত বাবাও তিন গোয়েন্দা পড়ে। বাবা আমার চেয়ে অনেক বেশি পড়ুয়া। যা পায় গোগ্রাসে গেলে। বড়দের বই না ছোটদের বই–তা নিয়ে বাছবিচার নেই। বই পেলেই হলো।' হাসল কাজল। 'বাবা যখন শুনল, আমি তোমাদের কাছে আসছি, জ্যাকেটটা দিয়ে দিল।'

'তবে একেবারে মুফতে দিয়েছেন ফুপা, তা মনে কোরো না,' হেসে বলল সেলিম। 'তিনি ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসাটা খুব ভাল বোঝেন। কেন দিয়েছেন জানো? কি রে কাজল, বলব?'

'বলো।'

'নাকি তুই বলবি?'

'অত ভণিতা করছ কেন। বলেই ফেলো না। একজন বললেই হলো।'

'একটা রহস্যের সমাধান করে দিতে হবে,' সেলিম বলল তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'রহস্য!'

উত্তেজনা বুঝতে পেরে রাফিও বলল, 'খুফ্! হাউ-আউ-আউউউ!' বোধহয় বলতে চাইল, 'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? আমরা গোয়েন্দা-মানুষ। রহস্যের সমাধান করার জন্যে আমাদেরকে অনুরোধ করতে আসবে লোকে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

মৃদুস্বরে তাকে ধমক দিয়ে থামাল জিনা। বলল, 'রাফি, চুপ! মাতব্বরী করিসনে। আগে শুনি কি ব্যাপার।'

'ব্যাপারটা হলো,' সেলিম বলল, 'জয়দেবপুরে কাজলদের একটা মস্তবড় ভেড়ার ফার্ম আছে। জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি জায়গা কিনে নিয়ে সেখানে ফার্ম করেছেন ফুপা। বিদেশী সহযোগিতায়।'

এই সময় ঘরে ঢুকলেন কিশোরের মামী। 'সেলিম, কখন এলে?'

'এই তো, কয়েক মিনিট। আন্টি, ও কাজল। আমার ফুপাত ভাই।'

মিসেস আরিফকে সালাম জানাল কাজল।

'দেখো আন্টি, ওরা আমার জন্যে কি জিনিস নিয়ে এসেছে,' জ্যাকেটটা তুলে দেখাল জিনা।

'খুব সুন্দর তো,' দেখার জন্যে এগিয়ে এলেন মিসেস আরিফ। হাতে নিয়ে

দেখতে লাগলেন।

জ্যাকেটটা কোথা থেকে এসেছে জানানো হলো তাঁকে।

'তোমার বাবার ফার্মে এত সুন্দর জ্যাকেট হয়?' অবাক হলেন মিসেস আরিফ।

'হ্যাঁ,' বিনীত হেসে মাথা ঝাঁকাল কাজল। 'শুধু জ্যাকেট না, ভেড়ার চামড়া থেকে পার্চমেন্টও তৈরি হয় আমাদের কারখানায়।'

'তাই নাকি?' মিসেস আরিফ আরও অবাক। 'বাংলাদেশে যে কেউ পার্চমেন্ট বানায়, জানতাম না তো। কিন্তু আমাদের দেশে কি পার্চমেন্ট চলে?'

'বাবা শখে বানায়। তবে ইদানীং কিছু কিছু চলতে আরম্ভ করেছে। সৌখিন মানুষের তো অভাব নেই। বাবা নিজেও সৌখিন। পার্চমেন্ট সংগ্রহের শখ। পৃথিবীর নানা দেশের তৈরি পার্চমেন্ট আছে বাবার সংগ্রহে। কিছু কিছু আছে অনেক পুরানো। বিদেশী ভাষায় লেখাটেখাও রয়েছে ওগুলোতে। কয়েকটাতে আছে দারুণ দারুণ সব পেইন্টিং।'

'তাই নাকি! দেখতে যেতে হবে তো একদিন,' মিসেস আরিফ বললেন।

'নিশ্চয় যাবেন।'

'আমারও কিন্তু আগ্রহ জাগিয়ে দিয়েছ,' কিশোর বলল।

'গুড। তোমাদেরকে নেয়ার জন্যে আমাকে আর কষ্ট করতে হলো না,' হাসল কাজল। 'বড় গলা করেই বলি, আমাদের কারখানা দেখে নিরাশ হবে না। যাই হোক, রহস্যটার কথা বলি। বাবার একটা পার্চমেন্টের গায়ে চারটা ছোট ছোট চমৎকার পেইন্টিং আছে। জিনিসটা কিনে প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয়নি বাবা। কিন্তু তারপর না দিয়ে আর পারল না। রহস্যময় অচেনা একজন লোক জানিয়েছে ছবিগুলোর মধ্যে নাকি একটা বিশেষ মেসেজ রয়েছে। বলেছে, মেসেজের মানে উদ্ধার করা গেলে কয়েকজন মানুষের সুখশান্তি আসবে, একটা পুরানো ভুলের সংশোধন হবে।'

'অদ্ভুত তো!' কিশোরের আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। 'তারমানে লোকটা সব জানে। তাহলে এ ভাবে রহস্য করে কথা বলল কেন? সব কথা খুলে বললেই পারত।'

'হয়তো বলতে চেয়েছিল,' কাজল বলল। 'কিন্তু সময় কিংবা সুযোগ পায়নি। আচমকা লাইন কেটে গেছে। কেউ হয়তো বাধা দিয়েছে তাকে। তারপর থেকে ছবিটার পেছনে লাগলাম আমরা। পরিবারের সবাই মিলে ছবিতে দেয়া মেসেজের মানে উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম। কোন লাভ হলো না। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলাম না।'

'কিছুই না?'

'কিচ্ছু না।'

'হুঁ!' আগ্রহ চরমে পৌঁছেছে কিশোরের। 'দেখা দরকার! কখন রওনা হচ্ছ?'

সেলিমের দিকে তাকাল কাজল। তার হাসিও এখন তুঙ্গে। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে, 'যখন তোমরা রেডি হবে।'

'আপাতত একাই যাওয়া যাক, কি বলো?' দুই সহকারী আর জিনার দিকে তাকাল কিশোর। 'শুনে মনে হচ্ছে, কাজলদের বাড়ির ওপর নজর আছে কারও। এত লোক আমরা একসঙ্গে গেলে সন্দেহ জাগতে পারে তার। গোড়াতেই গলদ হয়ে যাবে তাহলে।'

'তা কেন হবে? আমার বন্ধু-বান্ধবরা আমাদের বাড়িতে যেতে পারে না? দরকার হয় একটা পার্টি দিয়ে দেব,' কাজল বলল।

'পরে,' হাত নেড়ে বলল কিশোর। 'আগে আমি যাই তোমার সঙ্গে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। ওদেরকে তো নিতেই হবে। নিশ্চয় নিতে পাঠানোর জন্যে লোকের অভাব হবে না তোমাদের।'

'তা তো হবেই না। ঠিক আছে,' ঘাড় কাত করল কাজল। 'যা ভাল বোঝো। আমরা রহস্যের সমাধান হলেই খুশি।'

মিসেস আরিফের দিকে তাকাল কিশোর, 'মামী, কি বলো? যাব?'

কিশোরের কথায় মুচকি হাসলেন মিসেস আরিফ। 'আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভটা কি? মানা করলে কি আর শুনবে।'

'করেই দেখো,' হাসল কিশোর।

'উঁহু, বাবা, আমি তোমার আনন্দে বাধা দিতে রাজি না। রহস্য যখন পেয়ে গেছ, তোমাকে আর এখন ঠেকায় কে! তোমার মামাও পারবে না, আমি জানি।'

'মামা তো সেই যে ভোরবেলা বেরোল, এখনও এল না। এত কি কাজ?'

'জানি না।'

'মামা যদি এসে দেখে আমি নেই, না বলে জয়দেবপুর চলে যাওয়ার জন্যে বকাবকি করে?'

'সে-ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমিই সামলাব।'

লাফ দিয়ে গিয়ে মামীকে জড়িয়ে ধরল কিশোর। 'এ জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি আমি, মামী।'

কিশোরের কাণ্ড দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সেলিম, কাজল, মুসা আর রবিন।

মামীকে ছেড়ে দিয়ে কাজলের দিকে তাকাল কিশোর। 'তুমি বোসো। আমি রেডি হয়ে আসছি।'

হাতঘড়ি দেখল সেলিম। 'কাজল, তোমার কাজ তো করে দিলাম। হলো তো? আমি এখন যাই। জরুরী কাজ আছে এক জায়গায়। ওখান থেকে অফিসে যেতে হবে।'

'আচ্ছা, যাও,' ঘাড় কাত করল কিশোর। 'দেখা হবে।'

'হ্যাঁ, হবে।'

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল সেলিম।

মিসেস আরিফ চলে গেলেন রান্নাঘরে।

ওপরতলায় রওনা হলো কিশোর। তাকে অনুসরণ করল মুসা, রবিন ও জিনা। কাজলকে বলল কিশোর, 'তুমি আর এখানে একা একা বসে থেকে কি করবে? চলে এসো আমাদের সঙ্গে।'

চোখ মেলল রাফি। সবাইকে যেতে দেখে তারও একা থাকতে ইচ্ছে করল না। অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে হেলেদুলে রওনা দিল সিঁড়ির দিকে।

ওপরতলায় বেডরুমে ঢুকল কিশোর। ব্যাগ বের করে তাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরতে শুরু করল।

কাজল বলল, 'বেশি কাপড়চোপড় নেয়ার দরকার নেই।'

'না, তা নেবও না,' কিশোর বলল। 'অকারণ বোঝা বইতে আমিও পছন্দ করি না।'

হঠাৎ কান খাড়া করে ফেলল রাফি। একটা মুহূর্ত দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন বোঝার চেষ্টা করল। তারপর দৌড় দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল।

জিনা ডাক দিল, 'এই, কি হয়েছে?'

সন্দেহ হলো তার। বেরিয়ে এল বারান্দায়। পেছন পেছন কিশোরও বেরোল। কান পেতে শুনে বলল, 'দরজার শব্দ না?'

বলে একটা মুহূর্তও দাঁড়াল না কিশোর। দৌড়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। দেখতে পেল বসার ঘর থেকে বেরোনোর সদর দরজাটা হাঁ করে খোলা।

কি মনে হতে সোফার দিকে তাকাল।

নেই!

কাজলের আনা জ্যাকেটটা সোফার ওপরই ফেলে গিয়েছিল জিনা। এখন আর সেটা দেখতে পেল না কিশোর। জিনা ওপরে নিয়ে যায়নি। একটু আগেও এখানেই ছিল।

জিনাও নেমে এসেছে। কিশোরকে সোফার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে-ও তাকাল। চিৎকার করে উঠল, 'হায় হায়, জ্যাকেটটা তো নেই!'

'নিশ্চয় চোর ঢুকেছিল,' বলেই সদর দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর। ছুটে বেরোল বাইরে। পলকের জন্যে দেখল ড্রাইভওয়ের বাঁক ঘুরে দৌড়ে চলে যাচ্ছে একজন তরুণী মহিলা। গায়ে ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট।

কিশোরের পেছন পেছন রাফিও বেরিয়ে এসেছে। তাকে আদেশ দিল কিশোর, 'রাফি, ধর ওকে!'

বাঘের মত হাঁক ছেড়ে মহিলাকে তাড়া করল রাফি। কিশোর গেল তার পেছন পেছন। একটা সেকেন্ড পাশাপাশি ছুটল দু'জনে। তারপর তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল কুকুরটা।

গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে মহিলা।

কিশোরও বেরিয়ে এল। মহিলাকে দেখতে পেল। নির্জন রাস্তা ধরে ছুটছে। দৌড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এ কাজে অভ্যস্ত। নিয়মিত দৌড়ায়। অ্যাথলেটদের মত। ওদের কাছ থেকে অনেকটাই দূরে রয়েছে।

'দৌড়াচ্ছে কি দেখো!' পেছন থেকে বলে উঠল মুসা। 'ধরাই তো মুশকিল!'

গতি বাড়িয়ে কিশোরের পাশে চলে এল সে।

ফিরে তাকাল কিশোর। জিনা, কাজল আর রবিনকেও আসতে দেখল।

'পাকা চোর মনে হচ্ছে,' মুসা বলল।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, জ্যাকেটটার কথা ও জানল কি ভাবে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'আমি বুঝেছি,' জবাব দিল কাজল। 'পাতলা পলিথিনের ব্যাগে ভরে এনেছি জিনিসটা। আমি বাস থেকে নামার সময় নিশ্চয় চোখে পড়েছে ওর। আমাকে অনুসরণ করে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'তা হতে পারে। বাড়ির বাইরে এসে লুকিয়ে ছিল। নিশ্চয় জানালা দিয়ে নজরও রেখেছিল। আমরা ওপরতলায় চলে যেতেই ঘর খালি পেয়ে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু দরজা তো বন্ধ ছিল। ঢুকল কি ভাবে?'

রাফি ততক্ষণে পৌঁছে গেছে মহিলার কাছে। ঠিক এই সময় রাস্তার মাথায় এসে দাঁড়াল একজন টহল পুলিশ। এদিকেই আসছে। তবে বেশ দূরে রয়েছে এখনও মহিলার কাছ থেকে। ওদিক দিয়ে পালাতে পারবে না বুঝে মুহূর্তে মোড় নিয়ে একটা বাড়ির খোলা গেট দিয়ে ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ল মহিলা।

কিশোররা গেটের কাছে পৌঁছে আর মহিলাকে দেখতে পেল না। কিন্তু রাফিকে দেখল। ছুটে আসছে ওদের দিকেই। দাঁতে আটকে আছে ছেঁড়া কাপড়ের একটা টুকরো। ফেলছে না সেটা। কামড়ে ধরে রেখেছে।

ওর কাছে গিয়ে দাঁত থেকে কাপড়টা খুলে নিল কিশোর। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল একটা মুহূর্ত। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'মহিলার কামিজের কাপড়! কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে দেখো। রাফি, দারুণ একটা সূত্র রেখে দিলি যা হোক।'

ঘাউ ঘাউ করে কি যেন বোঝাতে চাইল রাফি।

'কি ব্যাপার? খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যেতে বলছিস?' রাফিকে প্রশ্ন করল জিনা।

বাড়িটার দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। নতুন তৈরি হচ্ছে। তবে কোন কারণে কাজ এখন পুরোপুরি বন্ধ। লোকজন কাউকে দেখা গেল না। বাড়ির পেছন দিকে ঝোপঝাড়, গাছপালা প্রচুর। কাটা হয়নি এখনও। তার মনে হলো,

ওরই কোন একটা ঝোপে লুকিয়ে পড়েনি তো মহিলা?

বাড়ির পাশ ঘুরে পেছন দিকে রওনা হলো সে। পেছনে এল তার সঙ্গীরা। একটা পাতাবাহারের ঝাড়ের কাছে এসে দেখল জিনার জ্যাকেটটা মাটিতে পড়ে আছে। ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে ওটার ওপর পড়ল রাফি। রাগে গরগর করতে থাকল।

জ্যাকেটটা তুলে নিল কিশোর। কুকুরটার মাথা চাপড়ে আদর করে দিয়ে বলল, 'রাফি. তোর তুলনা হয় না। মহিলাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছিস। তোকে দেখে এতটাই ভয় পেয়েছে, গা থেকে জ্যাকেটটাও খুলে ফেলে রেখে গেছে, ভেবেছে এটা ফেলে গেলে তুই শান্ত হবি। তারপরেও ছাড়িসনি। কামিজ ছিঁড়ে সূত্র রেখে দিয়েছিস।'

'কিন্তু গেল কোথায়?' এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল রবিন। 'বেরোতে তো দেখলাম না। আশেপাশেই কোথাও আছে।'

ঝোপের মধ্যে খুঁজতে শুরু করল ওরা। পাওয়া গেল না মহিলাকে। কোন দিকে গেছে অনুমানের চেষ্টা করল কিশোর। আলাদা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে বলল সবাইকে।

একেকজন একেক দিকে খুঁজে এসে সামনের চত্বরে জড় হলো ওরা।

মহিলাকে পাওয়া যায়নি।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বলল, 'যাকগে, কি আর করা। এত সুন্দর জ্যাকেটটা যে ফেরত পাওয়া গেল, এটাই সান্ত্বনা। তবে সূত্র যখন একটা রয়েছে হাতে, পুলিশকে দিলে তারা হয়তো মহিলাকে ধরার চেষ্টা করতে পারবে।'

হঠাৎ আবার ঘাউ ঘাউ শুরু করে দিল রাফি।

জিনা বলল, 'কি রে, আবার কিছু দেখলি নাকি? গন্ধ পেয়েছিস?'

একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। সাঁ করে একদৌড়ে গেটের বাইরে চলে গেল রাফি।

সবাই দৌড় দিল তার পেছন পেছন।

একটা গাড়ির পেছনে ছুটতে দেখল রাফিকে।

গাড়ির পেছনে ছুটছে কেন? অবাক লাগল গোয়েন্দাদের। ওরাও ছোটা শুরু করল রাফির পেছনে।

গাড়িটার কাছে চলে গেছে রাফি। ডাইনে-বাঁয়ে এমন ভাবে কাটা শুরু করেছে, ভয় পেয়ে গেল জিনা—রাফি না গাড়ির নিচে চলে যায়।

'রাফি! থাম! ফিরে আয়!' চিৎকার করে ডাকল সে।

পাত্তাই দিল না কুকুরটা।

গাড়ির সীটে বসা মহিলার ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। তাকে দেখেই বুঝে গেল কেন রাফি গাড়িটার পিছনে লেগেছে। রাফির ছিঁড়ে নিয়ে আসা কাপড়ের টুকরোটার সঙ্গে মহিলার পোশাকের অবিকল মিল।

ওদেরকে যে তাড়া করা হয়েছে, বুঝে গেছে ড্রাইভার। গতি বাড়িয়ে দিল। আর দৌড়ে লাভ নেই। ধরা যাবে না। দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। দূরে চলে যাবার আগেই নম্বর প্লেটের দিকে তাকিয়ে গাড়ির নম্বরটা মুখস্থ করে নিল। রাফিও বুঝল, আর তাড়া করে লাভ নেই। সে-ও ফিরে এল।

'অনেক ধন্যবাদ তোকে, রাফি,' কুকুরটার মাথা চাপড়ে আদর করে দিতে দিতে বলল কিশোর। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে মুসা, রবিন, জিনা ও কাজল।

'চলো, বাড়ি যাই,' কিশোর বলল।

তিন গোয়েন্দার কর্মকাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেছে কাজল। এত দ্রুত এত সূত্র জোগাড় করে ফেলবে ওরা কল্পনাই করেনি সে। লাইসেন্স প্লেটের নম্বরটা কিশোর মুখস্থ করে ফেলেছে শুনে বলল, 'যাক, একটা কাজের কাজই করেছ। পুলিশকে জানালেই গাড়ির মালিককে বের করে ফেলবে ওরা। চোরটাকে ধরা আর কঠিন কিছু হবে না...'

'যতটা সহজ ভাবছ ততটা না-ও হতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'কেন?'

'কারণ ওই চোরটা গাড়ির ড্রাইভার না-ও হতে পারে।'

'চুরি করে এনেছে বলতে চাও?'

'হ্যাঁ। আর তা যদি করে থাকে তাহলে গাড়িটা কোনখানে ফেলে দিয়ে চলে যাবে। এমনও হতে পারে, ড্রাইভার তার প্যাসেঞ্জারকে চেনেই না। মহিলা হয়তো গাড়িটা ভাড়া করেছে। অনেক প্রাইভেট কারের ড্রাইভার থাকে না, মালিকের অজান্তে ভাড়া খেটে বাড়তি দু'চার পয়সা কামিয়ে নেয়।'

হতাশ মনে হলো কাজলকে। 'অথচ আমি ভেবেছিলাম সহজেই ধরে ফেলা যাবে। যাকগে, আশা ছাড়ছি না। এখনও হয়তো সময় আছে। জলদি চলো, পুলিশকে গিয়ে জানাই।'

দুই

ওদেরকে জটলা করতে দেখে এগিয়ে এল টহল পুলিশের একজন হাবিলদার। কি হয়েছে জানতে চাইল। সব শুনে ওদেরকে থানায় নিয়ে যেতে চাইল সে।

'তোমরা এখানে দাঁড়াও,' সঙ্গীদের বলল কিশোর। 'আমি চট করে গিয়ে চামড়ার জ্যাকেটটা নিয়ে আসি।'

জ্যাকেট নিয়ে ফিরে আসতে সময় লাগল না তার।

হাবিলদারের সঙ্গে থানায় রওনা হলো ওরা।

যেতে যেতে কাজল জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাকেট দিয়ে কি করবে?'

'পরনের পোশাক থেকেও সূত্র আবিষ্কার করতে পারে পুলিশ।'

'কিন্তু এটা তো কেউ পরেনি...না না, পরেছিল। ওই মহিলা। কোন্ ধরনের সূত্র বের করতে পারবে বলে তোমার ধারণা?'

'এই যেমন যে পরেছে তার রক্তের গ্রুপ, চামড়ার ধরন, উচ্চতা, ওজন, সে নারী না পুরুষ...এ সব তথ্য অপরাধীকে ধরতে সাহায্য করে।'

'বাপরে! গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে এত কিছু ভাবো!'

'ভাবতে হয়। নইলে তদন্ত এগোয় না।'

কথা বলতে বলতে এগোল ওরা।

এক সময় হাবিলদার বলল, 'ওই যে, থানা।'

তিন গোয়েন্দাকে দেখেই চোখ বড় বড় করে ফেললেন ওসি ইলিয়াসউদ্দিন সাহেব। 'তোমরা! কবে এলে?'

'এই তো, কয়েক দিন,' হেসে জবাব দিল কিশোর। 'আপনাকে এখানে পাব ভাবতেই পারিনি, আঙ্কেল। ভালই হলো।'

'হ্যাঁ, আগের থানা থেকে বদলি হয়ে এসেছি,' জবাব দিলেন ওসি। 'তা তোমরা কি মনে করে?'

'একটা চোরের পেছনে ধাওয়া করেছিল, স্যার,' কিশোরের হয়ে জবাবটা দিল টহল পুলিশের হাবিলদার।

মুচকি হাসলেন ওসি। 'অ, এসেই শুরু করে দিয়েছ। কেসটেস পেলে নাকি?'

'কেস কিনা জানি না, তবে ব্যাপারটা রহস্যময়।'

'বলে ফেলো', ওসির মুখে মিটিমিটি হাসি।

কাজলের পরিচয় দিয়ে কিশোর বলল, 'ওর বাবার ভেড়ার ফার্মে তৈরি এই জ্যাকেটটা জিনাকে উপহার দিতে এনেছে কাজল। এটা রেখে সামান্য সময়ের জন্যে ওপরতলায় গিয়েছিলাম আমরা। ফিরে এসে দেখি নেই।'

ভুরু কুঁচকালেন ওসি। 'তারপর পেলে কি করে?'

'চোরের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি।'

ওসি সাহেবকে সব কথা খুলে বলল কিশোর। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোটা দেখাল।

'বাপরে! তোমাদের কুত্তাটাও তো এক সাংঘাতিক গোয়েন্দা!'

কিশোরদেরকে বসিয়ে কোক খাওয়ালেন ওসি। আরও কিছু কথাবার্তা হলো। বললেন, কাপড়ের টুকরোটা একটা বড় সূত্র হতে পারে। গাড়ির নম্বরটা লিখে নিয়ে বললেন, 'আমি এখুনি খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি।'

'যদি চোরাই গাড়ি হয়?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'তাহলে মহিলাকে ধরা কঠিন হয়ে যাবে। দেখি আগে খোঁজ নিয়ে। পরের কথা পরে। কাপড়ের টুকরোটা থাক। আমাদের পুলিশ ল্যাবরেটরিতে পাঠাব, পরীক্ষা করার জন্যে।'

ওসি সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে দলবল নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল কিশোর।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সব কথা শুনলেন কিশোরের-মামা আরিফ সাহেব। চোরটা বাড়ির মধ্যে কি ভাবে ঢুকল, সেটাও এক রহস্য। কেউ কোন ব্যাখ্যা দিতে পারল না। কয়েক সেকেন্ড লিভিং রুমে নীরবতা। কাজলও রয়েছে গোয়েন্দাদের সঙ্গে।

মাটিতে শুয়ে আছে রাফি। দরজা খোলার আলোচনা শুনতে শুনতে কান খাড়া করে ফেলল সে। লাফ দিয়ে উঠে পেছনের দুই পায়ে ভর করে খাড়া হয়ে গেল। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিল করজোড়ের ভঙ্গিতে।

হেসে ফেলল কাজল। 'দারুণ কুত্তা তো। দেখো, কেমন ভাঁড়ামি করছে।'

জিনা ওকে বলল, এটা ভাঁড়ামি নয়। কোন জরুরী মেসেজ দিতে চাইলে মাঝে মাঝে এ রকম করে ইঙ্গিত দেয় রাফি।

দরজার দিকে ছুটল কুকুরটা। সন্দেহ হলো জিনার; পিছে পিছে গেল সে-ও।

পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল রাফি। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নবটা। মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল।

অবাক হয়ে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইল কাজল। এ রকম বুদ্ধিমান কুকুর জীবনে দেখেনি সে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে জিনা। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'ও, তোর কাজ! তুইই দরজাটা খুলে রেখে পিসু করতে বাইরে গিয়েছিলি।'

'এবং এই সুযোগে ঢুকে পড়েছিল চোরটা,' জিনার কথার সঙ্গে যোগ করল কিশোর।

সবাইকে ঘিরে কয়েকটা ছোট ছোট লাফ দিয়ে কুকুর-নাচন নাচল রাফি। ঘাউ ঘাউ করে হাঁক ছাড়ল কয়েকবার।

'হুঁ,' গম্ভীর ভঙ্গিতে তিরস্কার করল কিশোর, 'কাউকে ডাকলেই পারতি। এ ভাবে দরজা খুলে রেখে যাওয়াটা উচিত হয়নি মোটেও।'

লজ্জা পেল রাফি। দুই পায়ের ফাঁকে ঢুকে গেল লেজটা। করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে নেতিয়ে পড়ল মেঝেতে।

'থাক থাক, আর কষ্ট পেতে হবে না,' আদর করে দিয়ে বলল কিশোর। 'ওঠ।'

আবার এসে সোফায় বসল সবাই। জয়দেবপুরে কাজলদের ভেড়ার খামারে

যাবার কথা মামাকে জানাল কিশোর। 'প্রথমে আমি যাব। অবশ্য তুমি অনুমতি দিলে। কি বলো, মামা?'

হাসলেন আরিফ সাহেব। 'জয়দেবপুরের জঙ্গলে ভেড়ার খামার, পার্চমেন্টে আঁকা ছবির রহস্য, সমাধান করার লোভ কি তুই ছাড়তে পারবি?'

'তুমি মানা করলে যাব না। তবে না যেতে দিলে খারাপ লাগবে,' কিশোর বলল।

'সত্যি কথাটা যে বলেছিস, সেজন্যে খুশি হলাম। যা। আমার কোন আপত্তি নেই।'

মামার হাতটা ধরে জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'থ্যাংকিউ মামা, থ্যাংকিউ! যাই হোক, প্রথমে আমি যাব। আমি গিয়ে খবর দিলে বাকি সবাই যাবে–মুসা, রবিন, জিনা, সবাই।'

'একটা পার্টি দেব ভাবছি,' কাজল বলল। 'আঙ্কেল, আন্টিকে নিয়ে আপনিও আসুন না। এলে খুব খুশি হব।'

'আমি এখন কথা দিতে পারছি না, বাবা,' আরিফ সাহেব বললেন। 'আমার একটা জরুরী কাজ আছে। তোমার বন্ধুদেরকে নিতে চাইছ নাও। পারলে পরে আমরাও নাহয় আসব। বোসো। আসছি। একটা ফোন করে আসি।'

কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে কাজলকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আচ্ছা, জয়দেবপুরে অসীম দেবনাথ বলে কাউকে চেনো নাকি?'

এমন ভাবে প্রশ্নটা করলেন আরিফ সাহেব, কিছুটা অবাকই হলো কাজল। 'আমি চিনি না। তবে বাবা চিনতে পারে। কেন বলুন তো?'

'না, জয়দেবপুরে জহির আবদুল্লাহ নামে আমার এক বন্ধু আছে তো,' কাজলকে বললেন আরিফ সাহেব। 'তাকে সব কথা বললাম। ছবি রহস্যের কথা শুনে অসীম দেবনাথের সাহায্য নিতে বলল জহির। দেবনাথ নাকি খুব ভাল আর্টিস্ট। জহিরের বিশ্বাস, ছবির মানে বুঝতে দেবনাথ তোমাদের সাহায্য করতে পারবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আর্টিস্ট যখন, পারারই তো কথা।'

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে কাজলকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে বেরোল তিন গোয়েন্দা। কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনল কিশোর। দুপুর নাগাদ বাড়ি ফিরে জিনিসপত্র গোছগাছ করল। দুপুরের খাওয়াটা সারতে তাই দেরি হয়ে গেল। ভাড়াটে ট্যাক্সিতে করে কাজলের সঙ্গে জয়দেবপুরে কাজলদের ভেড়ার খামারে এসে যখন পৌঁছল শীতের বিকেল গড়িয়ে গেছে তখন। দীর্ঘ হচ্ছে গোধূলির ছায়া।

ছয়শো একর জুড়ে তৈরি বিশাল খামার। মূল বাড়িটার দিকে এগোনোর সময় চারদিক দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'দারুণ জায়গা! সত্যি!'

মূল বাড়িটা ছাড়াও আরও প্রচুর বাড়িঘর আর ছাউনি রয়েছে এদিক ওদিক।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ শুনে বেরিয়ে এলেন কাজলের বাবা-মা। স্বাগত জানালেন কিশোরকে। কাজলের বাবার নাম শাহমায়ার খান আর মায়ের আসিয়া খানম।

লম্বা, সুদর্শন ভদ্রলোক শাহমায়ার খান। চুলের দুই পাশে সামান্য পাক ধরেছে। কালো চোখের তারা চকচকে উজ্জ্বল।

কাজলের মা ছোটখাট গড়নের, তবে খুব সুন্দরী। মায়ের সঙ্গে কাজলের চেহারার মিল বেশি। গড়নটা পেয়েছে বাবার।

মস্ত বসার ঘরটায় কিশোরকে নিয়ে গেল তারা। ঘরের আসবাবপত্র আর গোছানোর ঢং দেখে কিশোরের মনে হলো এক লাফে প্রায় একশো বছর পেছনে চলে এসেছে। পুরানো ডিজাইনের ভারী ভারী সব আসবাব। সম্ভবত কাজলের দাদার কিংবা আরও আগের আমলের।

কাজলের মা কাজলকে বললেন, 'ঠিকঠাক মত এসেছিস তো? পথে কোন অসুবিধে হয়নি?'

মাথা নাড়ল কাজল, 'না, মা।'

কাজলের বাবা হেসে বললেন, 'যাও, ভেড়াগুলোর সঙ্গে দেখা করে এসো। ওগুলো তো তোমার জন্যে কেঁদেকেটে অস্থির।'

খামারের কাজে বাবাকে সাহায্য করে কাজল। নতুন জন্মানো ভেড়ার বাচ্চাগুলো দেখাশোনার ভার তার ওপর। বিশেষ গোলাঘরের আলাদা খোঁয়াড়ে রাখা হয় বাচ্চাগুলোকে। বড় জানোয়ারের কাছাকাছি রাখলে বিপদ হতে পারে।

বসার ঘরের দেয়ালে ঝোলানো একটা বাঁধানো ছবির ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। বারো বাই বিশ ইঞ্চি সাইজ।

'এটাই সেই রহস্যময় ছবি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ,' কাজলের বাবা বললেন। 'আমরা তো চেষ্টা করে করে সারা। দেখো এখন, তুমি কিছু করতে পারো কিনা।'

'না না; এখন না, থাক,' তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন কাজলের আম্মা। 'এসেছ, হাতমুখ ধুয়ে নাস্তাটাস্তা করো। চা খাও। তারপর।'

চা খাওয়া শেষ করে ছবিটার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। ছবিটা চার ভাগ করা। ওপরের দিকের প্রথম ছবিটা একজন সুন্দরী মহিলার। দ্বিতীয়টা একজন পুরুষের, দর্শকের দিকে পেছন করে আছে। তৃতীয় ছবিটা বেশ নজর কাড়ল কিশোরের—একঝাঁক দেবদূত যেন মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে, কিংবা বলা যায় দেবদূতদের ঘিরে রেখেছে মেঘ। মাঝখানের মূর্তিটা একটা শিশুকে ধরে রেখেছে। শেষ ছবিটাতে রয়েছে একটা দুর্ঘটনার দৃশ্য। একটা বড় লঞ্চ—স্টীমার বলাই ভাল, গুঁতো মারছে একটা নৌকাকে।

কাজল আর তার বাবা এসে দাঁড়ালেন কিশোরের পেছনে।

'কি, ইয়াংম্যান?' জিজ্ঞেস করলেন কাজলের বাবা। 'কিছু বুঝতে পারলে? ছবিটার রহস্য জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি।'

'তেমন কিছু তো বুঝতে পারছি না, আঙ্কেল,' ছবির দিক থেকে চোখ সরাল না কিশোর। 'তবে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় ছবিটা যেন কোনও একটা পরিবারের কাহিনী বলতে চাইছে। শুরুতে সুখ ছিল পরিবারটায়, শেষ হয়েছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। আমার মনে হয় দ্বিতীয় আর শেষ ছবিটার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে। সম্ভবত দুর্ঘটনার সময় এই পেছন করে থাকা লোকটার কিছু ঘটেছিল।'

'সেই যোগসূত্রটা কি, তুমি বুঝতে পেরেছ?' জানতে চাইল কাজল।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এ মুহূর্তে অন্তত সামান্যতম ধারণাও নেই আমার। তবে কি বোঝাতে চেয়েছে সময় দিলে আশা করি বের করে ফেলতে পারব। প্রচুর ভাবতে হবে। ও, আঙ্কেল, এখানে অসীম দেবনাথ নামে কাউকে চেনেন? ভদ্রলোক আর্টিস্ট।'

'না। কেন?'

'জয়দেবপুরে মামার এক বন্ধু থাকেন, জহির আবদুল্লাহ। তিনিই দেবনাথের কথা বলেছেন। আর্টিস্ট মানুষ তো, ছবির মানে বোঝার ব্যাপারে হয়তো সহায়তা করতে পারবেন।'

'ভাল বলেছ তো।'

তাড়াতাড়ি ডিরেক্টরি ঘেঁটে অসীম দেবনাথের ফোন নম্বর বের করলেন খান সাহেব। ফোনে পাওয়া গেল না দেবনাথকে। একটা মহিলা কণ্ঠ জানাল, তিনি জয়দেবপুরে নেই। কয়েক দিনের জন্যে বাইরে গেছেন।

'অ,' খান সাহেব বললেন। 'ঠিক আছে, আমি পরে আবার ফোন করব।'

সারাদিন প্রচুর ঘোরাঘুরি হয়েছে। রাত বেশি না করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল কিশোর। পরদিন সকালে উঠে, নাস্তা সেরে প্রথমেই খামার দেখতে বেরোল কাজলের সঙ্গে। নতুন জন্মানো বাচ্চাগুলোকে দেখাতে নিয়ে এল কাজল। খুব সুন্দর। ভাল লাগল কিশোরের।

একটা বাচ্চার ওপর চোখ পড়তে অবাক হয়ে বলল, 'আরি, কালো বাচ্চা! দারুণ সুন্দর তো। কিন্তু এ ভাবে নেতিয়ে পড়ে আছে কেন এটা?'

ভেড়াগুলোর দেখাশোনায় নিয়োজিত যে লোকটা, তার নাম নেহাল মিয়া। কিশোরের কথা শুনে এগিয়ে এল।

'কিছু একটা হইছে এইডার, আমিও বুঝতে পারতাছি,' লোকটা বলল। 'মনে অয় কেউ পারা-টারা মারছে। মাইনষের পায়ের তলে পড়ছে, না গরুর পায়ের তলে বুঝবার পারতাছি না। উটতে পারে না। মনে অয় বাচব না। কসাইখানায়ই পাডাইতে অইব।' কাজলের দিকে তাকাল, 'ভাইজান, দিমু নাকি পাডাইয়া?'

'না, দেখি আগে, কি হয়েছে এটার।'

ভেড়ার বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করতে বসল কাজল। প্রথমে ওটার পা ডলে ডলে গরম করল সে। তারপর সারা গা ম্যাসাজ করে দিতে থাকল। কিশোর আর নেহাল মিয়া দু'জনকেই অবাক করে উঠে দাঁড়াল বাচ্চাটা। ব্যাঁ-ব্যাঁ করে চেঁচাতে শুরু করল।

'মনে অয় বাইচ্চা গেলগা,' নেহাল মিয়া বলল।

'আমারও তাই মনে হয়,' কাজল বলল। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। 'মাসখানেক পশু চিকিৎসার ট্রেনিং নিয়েছিলাম। কাজে লেগে যাচ্ছে।'

খামারের বাইরে তখন কর্মব্যস্ততা। ট্রাক, ঠেলাগাড়ি এ সবের শব্দ। কি চলছে ওখানে ভালমত দেখার জন্যে বাইরে বেরোল কিশোর। পেছন পেছন এল কাজল।

হঠাৎ গোলাঘরের একপাশ থেকে ছুটে বেরোল একটা গাড়ি। তীব্র গতিতে ছুটে এল দু'জনের দিকে। ওদের দেখেও সরার চেষ্টা করল না ড্রাইভার, কিংবা ইচ্ছে করেই সরাল না। বরং যেন চাপা দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

লাফ দিয়ে সরে গেল আতঙ্কিত কিশোর আর কাজল। গোলাঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। আর সরার জায়গা নেই।

তিন

স্যাঁৎ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল মস্ত গাড়িটা। অল্পের জন্যে লাগল না কিশোর বা কাজলের গায়ে। গাড়ির প্যাসেঞ্জার সীটে দাঁড়ানো একটা ছোট কুকুর। পাশ দিয়ে যাবার সময় গলা বাড়িয়ে খেঁক-খেঁক করে চিৎকার শুরু করল ওদের উদ্দেশে।

ধমক দিয়ে কুকুরটাকে থামানোর চেষ্টা করল ড্রাইভার। থামল না কুকুরটা।

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল লোকটা। দরজা খুলে লাফিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। খাটো, গাট্টাগোট্টা শরীর। ভারী পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল ছেলেদের কাছে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো যেন ওদেরই দোষ। কটমট করে তাকাল কাজলের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবা কোথায়?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে অভিযোগের সুরে কাজল বলল, 'আরেকটু হলেই তো দিয়েছিলেন মেরে! ঘটনাটা কি?'

তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল লোকটা। তর্ক বা ঝগড়ার মধ্যে আর না গিয়ে কিশোরের পরিচয় করিয়ে দিল কাজল, 'হারুণ আঙ্কেল, ও কিশোর পাশা। আমার

বন্ধু। আমেরিকায় থাকে। কিশোর, উনি আমাদের প্রতিবেশী।'

পরিচয়টাকে স্বাগত জানাল না হারুণ। কুতকুতে চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড কিশোরের দিকে। তারপর আচমকা খেঁকিয়ে উঠল, 'তোমার নাম যেন কোথাও শুনেছি? খবরের কাগজেই পড়েছি মনে হয়। কি ব্যাপার, খবরের কাগজের খবর হলে কেন? চুরিদারি করে জেলে গিয়েছিলে নাকি? না মস্তানি-চাঁদাবাজি করতে?'

লোকটার অভদ্রতায় অবাক হয়ে গেল কিশোর। রাগ লাগল। জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার হাত ধরে চাপ দিয়ে কথা না বলতে ইঙ্গিত করল কাজল। লোকটার দিকে তাকাল, 'হারুণ আঙ্কেল, বাবা বোধহয় ফ্যাক্টরিতে। সকালে উঠে ওখানেই আগে যায়।'

আর কিছু না বলে গোড়ালিতে ভর দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে গেল লোকটা। গটমট করে হেঁটে গিয়ে তার গাড়িতে উঠল। দড়াম করে দরজা লাগাল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে, গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। একনাগাড়ে চিৎকার করতেই থাকল তার কুকুরটা।

কিশোরকে বলল কাজল, 'লোকটা যেন কেমন, তাই না? কিন্তু তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেই হয় আমাদের। বাধ্য হয়ে। কারণ বাবার সবচেয়ে বড় ক্রেতাদের একজন ও। যাকগে। ফ্যাক্টরি দেখতে যাবে? পার্চমেন্ট কিভাবে বানায় দেখবে না?'

'হ্যাঁ, চলো।'

একসারি একতলা বিল্ডিঙের দিকে এগোনোর সময় কাজল বলল, 'সাংঘাতিক গন্ধ কিন্তু। সহ্য করতে পারবে তো?'

হাসল কিশোর। 'তোমরা পারলে আমি পারব না কেন?'

'আমাদের তো অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'যত খারাপ গন্ধই হোক, দেখব। পার্চমেন্ট কিভাবে বানায় দেখার এ সুযোগ ছাড়তে আমি রাজি না।'

সারির প্রথম ঘরটাতে ঢুকল দু'জনে। এখানে ভেড়ার গা থেকে লোম কাটা হয়। বৈদ্যুতিক ছুরির সাহায্যে। খুব দ্রুত কাটে। একটা ভেড়ার লোম কাটা হচ্ছে। মাঝে মাঝেই আর্তচিৎকার করে উঠছে ভেড়াটা। ব্যথা পাচ্ছে। অসাবধানে চামড়ায় বসে যাচ্ছে ছুরির ফলা।

লোম কাটা শেষ হতে ছেড়ে দেয়া হলো ভেড়াটাকে। তারের বেড়া দেয়া একটা সরু গলির ভেতর দিয়ে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হলো ওটাকে। আরেকটাকে ধরা হলো লোম কাটার জন্যে।

ওখান থেকে বেরিয়ে কিশোরকে কসাইখানায় নিয়ে এল কাজল।

'হ্যাঁ, সত্যিই দুর্গন্ধ!' নাক কুঁচকে বলল কিশোর।

'এখানে শুধু ভেড়া না, গরুও জবাই করা হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাংস টিনজাত করে বাজারে পাঠানো হয়। কাজল জানাল, বাংলাদেশে এ ধরনের আরও কারখানা গড়ে ওঠা উচিত। মাংস কেটে খোলা বাজারে বিক্রির জন্যে যে ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তারচেয়ে এটা অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। তা ছাড়া ক্রেতা-বিক্রেতা দু'জনেরই সুবিধে এতে অনেক বেশি। রক্ত, রস, গন্ধ ছড়ানোর ভয় নেই, মাংস রাখার জন্যে কসাইখানাও লাগবে না। যে কোন মুদি দোকানেও অন্যান্য টিনজাত জিনিসের মত সাজিয়ে রেখে বিক্রি করা যাবে।

এ তথ্য নতুন নয় কিশোরের কাছে। ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে মাংস টিনজাত করার প্রচুর কোম্পানি আছে।

গন্ধ থেকে বাঁচার জন্যে নাকে হাতচাপা দিয়ে রাখল কিশোর। 'চলো, পার্চমেন্ট কিভাবে বানানো হয় সেটা দেখি।'

কিশোরকে নিয়ে আরেকটা বিল্ডিঙে ঢুকল কাজল। ক্ষুর দিয়ে চেঁছে ভেড়ার কাঁচা চামড়া থেকে লোম পরিষ্কার করছে শ্রমিকেরা।

'লোম পুরোপুরি তুলে ফেলার পর চুন ছড়িয়ে রাখা হয় চামড়ার ওপর,' কাজল জানাল। 'চামড়ায় লেগে থাকা চর্বি কেটে যায় তাতে। তারপর চৌবাচ্চায় ফেলে ভালমত ধোয়ার পর টানটান করে ফ্রেমে আটকে ঝুলিয়ে দেয় শুকানোর জন্যে। ওই দেখো, কিভাবে ঝোলানো হয়েছে। এ ভাবে শুকালে খুব মসৃণ থাকে চামড়ার ভেতরের দিকটা।'

'হুঁ,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর, 'কাজটা খুব সহজ না। শুকানোর পর কি করে?'

'চামড়া থেকে আরেক পরত পর্দা তোলা হয়,' কাজল জানাল। 'তারপর সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে। ঘষতে ঘষতে পাতলা করে ফেলে।'

'অদ্ভুত কাণ্ড!' কিশোর বলল। 'এটাই পার্চমেন্ট? স্টেশনারি দোকানে গিয়ে কিনতে চাইলে যে জিনিস হাতে ধরিয়ে দেয় দোকানী সেগুলো এ ধরনের ভেড়ার চামড়ার টুকরো?'

'হ্যাঁ,' হেসে বলল কাজল। 'কাঠ থেকে মেশিনে যে কাগজ তৈরি করা হয়, তা থেকে এ জিনিস সম্পূর্ণ আলাদা। দামও অনেক বেশি। কেবল অতি সৌখিন লোকেরাই চিঠি লিখতে এ জিনিস ব্যবহার করে। আমাদের দেশে এ জিনিসের প্রচলন কম। নেই বললেই চলে। কাগজের সঙ্গে এর তফাৎ হলো, এটা অনেক বেশি টেকসই।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'তারপরেও আমি কখনও চিঠি লিখতে কোন প্রাণীর চামড়াকে ব্যবহার করতে যাব না। টেকসই বলেই নিশ্চয় আর্টিস্টরাও পার্চমেন্টের ওপর ছবি আঁকে। ওহ্‌হো, কারখানা দেখতে দেখতে আসল কথাটাই ভুলে গেছি। পার্চমেন্টে আঁকা ছবি রহস্যের সমাধান করতে হবে না?'

'আমি ভুলিনি। সেটা পরেও করা যাবে। চলো, আগে এক বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। এখানকার কর্মচারী শ্রমিকই, তবে কারখানার নয়, ভেড়ার রাখাল। আবদুল ওহাব। সবাই ডাকে ভেড়া ওহাব। তাতে অবশ্য সে মাইন্ড করে না।' হাত তুলে দূরে দেখাল কাজল, 'ওই যে ওদিকে বনের মধ্যে তার ঝুপড়ি।'

'অনেক দূর,' কিশোর বলল।

'হাঁটতে না চাইলে মোটর সাইকেল নিতে পারি। নেব?'

'না না, লাগবে না। হেঁটেই যেতে পারব। বনের মধ্যে হাঁটতে ভাল লাগবে। যা দারুণ সুন্দর জায়গা।'

একটা ছাউনির পাশ দিয়ে যাবার সময় শিকলে বাঁধা একটা কুকুর দেখা গেল। কাজলকে দেখে চেঁচাতে শুরু করল কুকুরটা।

হেসে এগিয়ে গেল কাজল। কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'কি রে, চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'ছেড়ে দিতে বলছে আরকি,' কিশোর বলল। 'কি নাম ওর?'

'ডিংগো। অস্ট্রেলিয়ান বুনো কুকুরের নামে নাম।'

'বুঝলাম। কিন্তু দেশি কুকুরের অস্ট্রেলিয়ান নাম কেন?'

'রাখলাম। ডিংগো কুকুরগুলোকে আমার ভাল লাগে। পেলে এনে পুষতাম।' কুকুরটার শিকল খুলে দিল কাজল। 'ডিংগো। ও কিশোর পাশা। আমাদের বন্ধু। হাত মেলা।'

পেছনের দুই পা মুড়ে বসে সামনের একটা থাবা তুলে দিল ডিংগো। সেটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল কিশোর, 'বাহ, তুইও তো দেখি আমাদের রাফির মত। ভাল বন্ধুত্ব হবে তোদের।'

মুখ উঁচু করে ঝাঁকি দিয়ে ডিংগো বলল, 'খুফ! খুফ!' যেন বোঝাতে চাইল, আগে আসুক তো।

হাসতে লাগল কিশোর, 'মহাপণ্ডিত।' ডিংগোর কানের গোড়া চুলকে আদর করে দিল। তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল কুকুরটার। 'তা কি করিসরে তুই? ভেড়া পাহারা দিস নাকি?'

ভেড়ার কথাতে কান খাড়া করে ফেলল কুকুরটা। সোজা রওনা হলো বনের দিকে, কিশোররা যেদিকে যাচ্ছিল। পিছে পিছে যেতে যেতে কিশোরকে জানাল কাজল, 'ভেড়া খুব ভালবাসে ডিংগো। আবদুল ওহাবকেও। ছাড়া পেয়েই কেমন ছুটেছে ওদিকে দেখো না।'

খামারের প্রান্তে বড় বড় গজারি গাছগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লেগে এমন করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন গাছের বেড়া। সেগুলোর নিচ দিয়ে বনে ঢুকল ওরা। এখানে একেবারে ভিন্ন পরিবেশ, খামারের চেয়ে আলাদা। গাছের মাথায় ডালপালার ফাঁক

দিয়ে রোদের বর্শা এসে বিচিত্র আলোর নকশা সৃষ্টি করেছে মাটিতে। বাতাসে গজারি বনের মিষ্টি সুবাস। কিঁচিক করে ডাক ছেড়ে দুটো শালিক উড়ে গেল। একটা দোয়েল এসে বসল মাথার ওপরের ডালে। মিষ্টি শিস দিয়ে তার সঙ্গিনীকে ডাকতে শুরু করল। রূপকথার রাজ্য মনে হতে লাগল কিশোরের। দু'চোখ মেলে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখছে সে, বেরসিকের মত কানে বেজে উঠল কাজলের কণ্ঠ, 'ওই যে, আবদুল ওহাবের ঝুপড়ি।'

গাছের ফাঁক দিয়ে একটা কুঁড়েঘর চোখে পড়ল কিশোরের।

'কিন্তু গেল কোথায় ওহাব?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কাজল। 'ঘরের বাইরে থাকলে সারাক্ষণ ওই বড় গাছটার শিকড়ে বসে থাকে। আপনমনে বিড়ি ফোঁকে আর আধ্যাত্মিক গান গায়।'

'ভেড়ার পাল কই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে, ওই ওদিকটায়,' হাত তুলে দেখাল কাজল। 'ওই ঝোপগুলো পেরোলেই দেখতে পাবে। বড় বড় ঘাস আছে। পাশে ডোবা আছে। শত্রুও আছে।'

'চোর?'

মাথা ঝাঁকাল কাজল, 'হ্যাঁ।'

'মানুষ।'

হাসল কাজল। 'মানুষও আছে, জন্তুও আছে।'

'ভেড়ার এক নম্বর শত্রু তো জানি নেকড়ে আর কায়োট। কিন্তু বাংলাদেশে তো ওই দুটো জানোয়ারের একটাও নেই।'

'তা নেই। তবে ওদের জাতভাই শেয়াল তো আছে। শেয়ালের অভাব নেই গজারিবনে। বাঘা বাঘা সাইজের এককেটা। সুযোগ পেলে কবর থেকে মানুষের লাশ তুলে খেয়ে ফেলে, আর ছাগল-ভেড়া তো ওদের কাছে রসগোল্লা। ভেড়া আর ছাগলের বাচ্চার জাতদুশমন ওই শেয়াল।'

ওহাবের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল কাজল।

সাড়া পেল না।

অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে আনমনে বিড়বিড় করল, 'আশ্চর্য! গেল কোথায় লোকটা?'

ওর পায়ের কাছেই দাঁড়ানো ছিল ডিংগো। আচমকা এক হাঁক ছেড়ে দৌড় দিল ঝোপগুলোর দিকে।

কিশোরের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কাজল। 'চলো তো দেখি! নিশ্চয় কোন অঘটন!'

চার

কাজলের পেছন পেছন দৌড় দিল কিশোর। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ভেড়ার পাল। কোনটা দাঁড়ানো, কোনটা ঘাস খাচ্ছে, কোনটা শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। মাঝখান দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে পায়ে বেধে যায়। শুয়ে থাকা একটা ভেড়াকে ডিঙাতে গিয়ে একটা ভেড়ার বাচ্চার লেজ মাড়িয়ে দিল কিশোর। ব্যাঁ করে চিৎকার দিয়ে উঠল বাচ্চাটা।

'ইস্ রে!' বলে তাড়াহুড়ার মধ্যেও বসে পড়ে বাচ্চাটার লেজটা ডলে দিল কিশোর। তারপর আবার উঠে দৌড় দিল কাজলের পেছনে।

দৌড়াতে দৌড়াতে একটা ঝোপের অন্যপাশ ঘুরে এসে দেখা গেল সামনে বেশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে জায়গাটা। ঘন গাছপালার মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে দেখা গেল দু'জন লোককে।

'ওরাই বোধহয় এই গোলমালের কারণ,' কাজলকে বলল কিশোর। 'চেনো নাকি ওদের?'

'না। বোধহয় ভেড়া চুরি করতে এসেছিল।'

বেশ অনেকটা দূরে রয়েছে লোকগুলো। এত দূর থেকে চেহারা চেনা যাচ্ছে না। দৌড়াতে দৌড়াতে গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। পিছু নিয়ে ধরা যাবে না বুঝে থেমে গেল কাজল। তার ঘাড়ের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল কিশোর।

আগে আগে ছুটছিল ডিংগো। কিশোররা দাঁড়িয়ে যেতেই সে-ও দাঁড়িয়ে গেল। অনেকটা এগিয়ে ছিল, ফিরে এল লেজ নাড়তে নাড়তে।

মাথা চাপড়ে ওকে আদর করে দিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল কাজল। 'কিন্তু ওহাব গেল কই?'

কিশোরও চারপাশে তাকিয়ে ভেড়ার রাখালকে খুঁজতে লাগল।

কাজল বলল, 'ভেড়া ফেলে তো কোথাও যায় না সে। আশ্চর্য! চলো তো ওর ঘরে গিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি। কুম্ভকর্ণের ঘুম নাকিরে বাবা। এত হাঁকডাকেও ভাঙে না!'

ওহাবের ঝুপড়ির কাছে ফিরে এল দু'জনে। নাম ধরে ডাকতে লাগল কাজল। জবাব নেই। ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল। নেই ওহাব।

'সত্যিই অবাক লাগছে! দুশ্চিন্তাও হচ্ছে!' ডিংগোকে নির্দেশ দিল কাজল, 'ডিংগো, দেখ্ তো ওহাব কোথায়। খুঁজে বের কর।'

মাথা কাত করে কাজলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল ডিংগো। নাক নিচু করে মাটি শুঁকতে শুরু করল। তারপর এগিয়ে চলল পায়ে পায়ে। চলে গেল ঝোপঝাড়ের দিকে।

ঝুপড়িটার আশেপাশে খুঁজে দেখল কাজল আর কিশোর। ওহাব কোথায় গেল কিছুই বুঝতে পারল না।

'অবাক কাণ্ড!' কাজল বলল। 'ভেড়া ফেলে চলে গেছে ওহাব, বিশ্বাসই করতে পারছি না। কখনোই ভেড়ার পালকে ছেড়ে রেখে এ ভাবে সরে না সে।'

ঠিক এই সময় ডিংগোর ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। দৌড় দিল সেদিকে দু'জনে। ঝোপ পেরিয়ে এসে কতগুলো চারাগাছের জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ডিংগোকে। ওহাবের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে সে। মাটিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে বুড়ো ওহাব।

তার দু'পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কিশোর আর কাজল। ঠোঁট নড়ে উঠল ওহাবের। জ্ঞান ফিরতে শুরু করেছে। বিড়বিড় করে কি যে বলল কিছুই বোঝা গেল না।

ভুরু কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কাজলের দিকে তাকাল কিশোর। নীরবে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল কাজল, সে-ও কিছু বুঝতে পারছে না।

আবার বিড়বিড় করল ওহাব।

কিশোরের দিকে তাকাল কাজল। 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছে নাকি?'

'ঘুমায়নি তো। বেহুঁশ হয়ে গেছে।'

'খুব সময়মত চলে এসেছিলাম। নইলে আজকে ক'টা ভেড়া যে গাপ করে দিত আল্লাহই জানে।'

'কিন্তু ভেড়া চুরি করতে এসেছিল, না অন্য কিছু করতে এসেছিল, জানছ কি করে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তা-ও তো কথা,' মাথা নেড়ে সায় জানাল কাজল। 'দেখি, ওহাবের হুঁশ ফিরলে হয়তো কিছু বলতে পারবে। ওর হুঁশ ফেরানো দরকার।'

ডোবা থেকে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে এসে ওহাবের চোখেমুখে ছিটাতে শুরু করল দু'জনে। খানিক পরেই চোখ মেলল ওহাব। কাজলকে তার মুখের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে মলিন হাসি হাসল। কাজল আর কিশোরের সহযোগিতায় দুর্বল-ভঙ্গিতে উঠে বসল।

মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরের ঘোলাটে ভাবটা দূর করার চেষ্টা করল ওহাব। কিশোরকে দেখিয়ে কাজলকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কে?'

'আমার বন্ধু। আমেরিকায় থাকে,' কাজল বলল।

লজ্জিত ভঙ্গিতে ওহাব বলল, 'ঘুমাইয়া গেছিলাম। ক্যান যে এইভাবে ঘুমাইয়া পড়লাম কে জানে!'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল কাজল আর কিশোর। ওহাব মিথ্যে বলছে বুঝে গেল। কাজল বলল, 'ওহাবভাই, তুমি ঘুমাওনি। বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে। কি হয়েছিল?'

মাথা নিচু করল ওহাব। ভাবল কিছু। মুখ তুলল আবার। 'কাজলভাই, আমি আপনের কাছে কিছু লুকামু না। দুইডা লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আইছিল। আমারে একটা কাম কইরা দেয়নের লাইগা চাপাচাপি করতে লাগল। কোনমতেই যখন রাজি অইলাম না, খেইপ্পা গিয়া মাথায় মারল বাড়ি। আমারে কিচ্ছু করনের সুযোগ দিল না। তারপর আন্ধার দুনিয়া।'

লোকগুলোকে দৌড়ে যেতে দেখেছে, জানাল কাজল।

'ওরা খারাপ লোক, কাজলভাই,' ওহাব বলল। 'খুব খারাপ। ওদের ধরার লাইগা পিছে পিছে যে যান নাই, খুব ভালা করছেন।'

লোকগুলো কেন দেখা করতে এসেছিল, কি কাজ করে দিতে বলেছে, বার বার জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পেল না কাজল। মাথা নেড়ে ওহাব বলল, 'আমারে আর জিগাইয়েন না, কাজলভাই। আমি কইবার পারুম না। খালি এইটুক শোনেন, আমারে ইমুন একটা কাম করবার কইছিল, যেইডা আমি কোনমতেই করতে রাজি অই নাই। কাজলভাই, যা অইছে অইছে, ভুইলা যান। ওদের পিছে লাগনের কাম নাই। বড় রকমের ক্ষতি কইরা ফালাইব।'

শক্তি অনেকটা ফিরে পেয়েছে ওহাব। উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে লাগল তার ঝুপড়ির দিকে। সঙ্গে এগোল কাজল আর কিশোর। পুরোটা সময় চুপচাপ ওদের কাছে বসে ছিল ডিংগো। সে-ও চলল ওদের সঙ্গে।

ঝুপড়িটার কাছে এসে ফিরে তাকাল ওহাব। কিশোরকে দেখিয়ে কাজলকে বলল, 'মেমান লইয়া আইছেন। একটু বসেন। ডাব পাইরা রাখছি। দুইডা ডাব কাইট্টা লইয়া আসি।'

দৌড়াতে দৌড়াতে গলা শুকিয়ে গেছে দু'জনেরই। ডাবের কথা শুনে খুশিই হলো কাজল। বলল, 'ঠিক আছে নিয়ে এসো। আমরা ওই গাছের শিকড়টায় বসছি।'

দুই হাতে দুটো কাটা ডাব নিয়ে ফিরে এল ওহাব। পানি খেয়ে খালি খোসাটা ফেলে দিয়ে পকেট থেকে একটা মোবাইল টেলিফোন বের করল কাজল। ওহাবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, এটা রেখে দাও। আবার যদি এ ধরনের কোন অঘটন ঘটে, কিংবা কেউ তোমাকে হুমকি দিতে আসে, সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানাবে।'

হাতে নিয়ে সেটটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে লাজুক হাসি হেসে ওহাব বলল, 'কিন্তু আমি যে এইডা ব্যবহার করতে জানি না, কাজলভাই।'

'দাও, শিখিয়ে দিচ্ছি।'

ওহাবের বুদ্ধিশুদ্ধি ভালই। শিখতে সময় লাগল না। কোন্ নম্বরে ফোন করলে কন্ট্রোলরুমের সঙ্গে কথা বলতে পারবে সেটাও মুখস্থ করে নিল। কথাও বলল একবার। দু'গালে ছড়িয়ে গেল হাসি। মাথা দুলিয়ে বলল, 'খুব ভালা জিনিস।'

ওহাবকে সাবধান থাকতে বলল কাজল। কিশোরকে নিয়ে খামারে ফিরে চলল।

কিশোর বলল, 'মোবাইল ব্যবহারের সময় দেবে কিনা সন্দেহ। ওকে যে পিটিয়ে বেহুঁশ করে ফেলবে, ও তো বুঝতেই পারেনি।'

মাথা ঝাঁকাল কাজল। 'তা ঠিক। তবে ওদের আসতে দেখে যদি সতর্ক হয়ে গিয়ে ফোনটা করে ফেলতে পারে, তাহলে ধরার ব্যবস্থা করা যায়।'

'ওকে কি কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল লোকগুলো, কিছু অনুমান করতে পারো?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কাজল। 'হয়তো ভেড়া চুরি করার প্রস্তাব দিয়েছিল। ও যাতে চেঁচামেচি না করে সেজন্যে টাকা দিতে চেয়েছিল।'

'আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। চুরিদারির মত সাধারণ কোন ব্যাপার নয়। তাহলে আমাদের বলে দিত। ওর নিজস্ব কোন ব্যাপার হতে পারে, যেটাতে সে জড়িত। এর সঙ্গে খামারের সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে।'

'সেটা কি?'

'জানতে পারলে ভাল হত,' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে দু'তিনবার চিমটি কাটল কিশোর।

'চলো, বাবাকে গিয়ে বলি। বাবা হয়তো কিছু আন্দাজ করতে পারবে।'

কয়েক সেকেন্ড নীরবে হাঁটার পর কাজল বলল, 'ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। ভেড়া চুরি যাওয়া, কিংবা শেয়ালে নেয়া নতুন কিছু না। কিন্তু খামারের সীমানায় ঢুকে রাখালকে পিটিয়ে বেহুঁশ করার ঘটনা এই প্রথম। ভাল লাগছে না আমার। কোথায় যেন কি একটা খটকা রয়ে গেছে। লোকগুলোর চেহারা দেখতে পারতাম যদি, চিনতে পারতাম, ভাল হত!'

বাড়ি ফিরে বাবাকে সব কথা জানাল কাজল।

শুনে গম্ভীর হলেন খান সাহেব। 'পুলিশকে জানানো দরকার।' টেলিফোন করতে চলে গেলেন তিনি।

দেয়ালে ঝোলানো পেইন্টিংটার দিকে তাকাল কিশোর। যেটার রহস্য সমাধান করতে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। পার্চমেন্টে আঁকা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করল।

টেলিফোন সেরে ফিরে এলেন খান সাহেব। কিশোরের পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বুঝতে পারলে নাকি?'

'আর্টিস্টের নামটাম তো দেখতে পাচ্ছি না,' জবাব দিল কিশোর। 'সাধারণত

কোণের দিকে নাম সই করে রাখে শিল্পীরা। এটাতে দেখছি না।'

'নেইই যখন, দেখবে আর কোত্থেকে,' খান সাহেব বললেন।

'প্রথম ছবিটা একজন সুন্দরী মহিলার,' আপনমনেই বলল কিশোর। 'কিন্তু ছবিতে কিছু করতে দেখা যাচ্ছে না তাকে। কোন মেসেজ দিচ্ছে না এ ছবি। কিংবা দিলেও সেটা বোঝা যাচ্ছে না।'

'তা ঠিক। দ্বিতীয় ছবিটা কি বলে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল কিশোর, 'একজন পুরুষ মানুষের দেহের ওপরের অংশ...পেছন করা...দৈহিক গঠন কেমন, চুলের রঙ কি, বোঝা যায় এ থেকে। কিন্তু কি বোঝাতে চেয়েছে এখনও মাথায় ঢুকছে না আমার।'

'হুঁ,' খান সাহেব শুধু বললেন।

'চারটে ছবির মধ্যে তিন নম্বর ছবিটা চোখে পড়ে বেশি,' নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর। 'বাতাসে উড়ন্ত আলখেল্লা পরা দেবদূতের দল। মাঝখানের দেবদূত একজন শিশুকে তুলে ধরে রেখেছে। বাকি সবাই ভক্তি সহকারে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। সুন্দর ছবি। খুব দক্ষ শিল্পীর পক্ষেই কেবল এত সুন্দর করে আঁকা সম্ভব। এখানেও কোন মেসেজ নিশ্চয় আছে।'

'তবে চার নম্বর ছবিটা বোঝা যায়,' কাজল বলল। 'একটা নৌকাকে গুঁতো মারছে একটা জাহাজ—দুর্ঘটনা বোঝাতে চেয়েছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দুর্ঘটনাটা কোন্ ধরনের? স্বাভাবিক, না ইচ্ছাকৃত? জেনেশুনে ইচ্ছে করেই নৌকাটাকে গুঁতো মেরেছে হয়তো জাহাজটা, আরোহীদের খুন করার জন্যে,' কিশোর বলল।

আচমকা কি মনে হতে ঝটকা দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। খান সাহেবের দিকে তাকিয়ে যেন ছুঁড়ে দিল প্রশ্নটা, 'আঙ্কেল, ছবিটা কার কাছ থেকে কিনেছেন?'

'আমার প্রতিবেশী, হারুণ চৌহানের কাছ থেকে,' জবাব দিলেন খান সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তিতে ভরা সেই লোকটার চেহারা মনের পর্দায় ভেসে উঠল কিশোরের, যে আরেকটু হলেই গাড়ি দিয়ে গুঁতো মেরে দিচ্ছিল ওদের। 'তিনি কোথায় পেয়েছেন, বলেছেন আপনাকে?'

'নিলামে কিনেছিল কোনখান থেকে। কিছুদিন রেখে ভাল না লাগায় বিক্রি করে দিয়েছে। আমি পার্চমেন্টে আগ্রহী জেনে আমাকেই বলেছে প্রথমে।'

'মিস্টার চৌহান ছবিগুলোর রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন?'

'না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, এর মধ্যে যে কোন রহস্য আছে, এ কথাটাই তার মাথায় আসেনি। কোনও কৌতূহল দেখায়নি।'

'ফ্রেম থেকে ছবিটা কখনও খুলেছিলেন?'

'না,' জবাব দিলেন খান সাহেব। 'কেন?'

'পেছনেও যে মেসেজ থাকতে পারে, জরুরী কোন সূত্র, সেকথা ভেবেছেন?'

'না তো!' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন খান সাহেব। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এক্ষুণি খুলছি।'

পাঁচ

খুব যত্ন করে ফ্রেম লাগানো হয়েছে ছবিটার। দেখে মনে হয় না লাগানোর পর কখনও খোলা হয়েছে। সাবধানে পেছনের কাগজ আর মলাট খুলে নিলেন তিনি। বের করে আনলেন ছবিটা। সবার দেখার জন্যে তুলে ধরলেন।

'বাহ্, খোলা অবস্থায় তো আরও বেশি সুন্দর!' কাজল বলল।

কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন খান সাহেব। হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল কিশোর।

'এই যে, পেছনে "এ" লেখা।' ছবিটা ওল্টাল সে। 'দেখুন, অক্ষরটা বাচ্চার ছবিটার ঠিক পেছনে রয়েছে।'

'মানে কি এর?'

'নামের আদ্যক্ষর হতে পারে।'

'আর কিছু লেখা আছে নাকি দেখো তো,' ছবিটার দিকে ঝুঁকে এল কাজল।

'আছে, এই যে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ডান দিকের নিচের কোনায় লেখা রয়েছে ইংরেজি "এস" ও "সি" দুটো অক্ষর। এস সি, এ দুটোও কারও নামের আদ্যক্ষর হতে পারে। তার নিচে লেখা "ইয়াঙ্গুন"।'

'ইয়াঙ্গুন!' ভুরু কুঁচকালেন খান সাহেব। 'আগের রেঙ্গুন শহরের কথা বলেনি তো?'

'হতে পারে,' মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'আঙ্কেল, হারুণ চৌহান কোথাকার লোক কখনও জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'না তো।'

'আমার মনে হয় হারুণ চৌহান মিয়ানমারের লোক। ইয়াঙ্গুনে বাড়ি : কিংবা ওখানে থেকেছেন।'

'এবং ওখানেই কিনেছিল ছবিটা,' কিশোরের কথাটা যেন লুফে নিলেন খান সাহেব। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'গোয়েন্দা হিসেবে কেন তোমার এত নাম, এখন বুঝতে পারছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কত সূত্র বের করে ফেললে। ফ্রেম খুলে সূত্র খোঁজার কথা মাথায়ই আসেনি আমার।'

'এখনই প্রশংসা শুরু করে দেবেন না,' হেসে বলল কিশোর। 'আগে পুরো রহস্যটা উদঘাটন করি।'

চোখ সরু করে কিশোরের দিকে তাকাল কাজল। 'তদন্ত করতে মিয়ানমারে যাবে নাকি?'

'তার আগে মিস্টার চৌহানের সঙ্গে দেখা করতে যাব। তিনি হয়তো মূল্যবান আরও অনেক তথ্য জানাতে পারবেন।'

একমত হলেন কাজলের বাবা। 'আজ রাতেই আবার চলে যেয়ো না। সকালটা হোক। তারপর।'

হারুণের ফার্মের কথা কাজলকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। কাজল বলল, 'ফার্মটা তো জানিই কোনখানে। তবে ভেতরে যাইনি কখনও। ভেতরটা কেমন জানি না। বাবা, তুমি জানো কিছু?

'জানি,' খান সাহেব বললেন। 'যাওয়ার আগে অবশ্যই হারুণ সাহেবের অনুমতি নিয়ে নেবে। কোনমতেই যেন ভেবে না বসে আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরকে। ছবি রহস্যের সমাধান হোক বা না হোক, কেউ আমাকে বিনা কারণে সন্দেহ করলে ভাল লাগবে না আমার। হারুণ চৌহান আমার একজন বড় কাস্টোমার। তাকে খোয়াতে চাই না।'

অনুমতি নিয়েই যাবে, কথা দিল কিশোর। আর এমন কিছু করবে না যাতে খান সাহেবের মানহানি হয়।

আপাতত আর কোন কাজ নেই। ঘুমাতে গেল দুই গোয়েন্দা।

পরদিন সকালে নাস্তার পর মোটর সাইকেল নিয়ে বেরোল দু'জনে। চৌহান ফার্মের সামনে এসে থামল। কিশোর লক্ষ করল মূল বাড়িসহ ফার্মের সমস্ত বাড়িগুলোকে ঘিরে উঁচু দেয়াল। মেইন গেটে লোহার দরজা। অতিরিক্ত সুরক্ষিত। কি প্রয়োজন এর বুঝতে পারল না কিশোর। অবাক হয়ে তাকাল কাজলের দিকে। কাজলও অবাক।

'কেন আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন আঙ্কেল, এখন বুঝলাম,' কিশোর বলল। 'লোকটা অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ। বিদেশী যে আমি এখন শিওর। কাউকে বিশ্বাস করে না মনে হয়। নইলে নিজের বাড়িঘরকে এ ভাবে জেলখানা বানিয়ে রাখার মানে কি? এ রকম বন্দি হয়ে কি বাঁচা যায়!'

গেটের পাল্লায় ঠেলা দিল কাজল। ভেতর থেকে বন্ধ। 'ডাকার উপায় কি?'

'এই যে, ঘণ্টার বোতাম,' টিপে দিল কিশোর।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। সাড়া পেল না। আবার বোতাম টিপল কিশোর। টিপে ধরে রাখল কয়েক সেকেন্ড। তারপরেও জবাব এল না।

'ঘণ্টা শুনছে না কেউ এ কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার,' কাজল বলল। 'দূরে তো। আসতে দেরি হচ্ছে। নিশ্চয় এসে খুলে দেবে।'

নাকি ঘণ্টাটার শব্দ দেয়ালের দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'চেষ্টা করলে ডিঙানো যায়। করব নাকি?'

'কেউ খুলে না দিলে আর কি করব? দেয়াল ডিঙিয়েই ঢুকতে হবে,' কাজল বলল।

হাত উঁচু করে লাফ দিয়ে দেয়ালের কিনার ধরে ঝুলে পড়ল দু'জনে। তারপর বেয়ে উঠে গেল ওপরে। লাফিয়ে নামল ওপাশে। সামনে একটা লম্বা গলি। দু'পাশে দেয়াল।

'একেবারেই তো জেলখানা,' গলা লম্বা করে দিয়ে গলির ওপাশে কি আছে দেখার চেষ্টা করল কাজল। 'আল্লাহই জানে, সামনে কি দেখব! হয়তো দেখা যাবে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে: এখানকার মানুষ হইতে সাবধান, কামড়ে দিতে পারে!'

'ভাল বলেছ তো!' হেসে ফেলল কিশোর। 'তবে সাবধান। চোখকান খোলা রাখো। কোন কিছু মিস করতে চাই না। ওই দেখো, বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়ানো। তারমানে বাড়িতে লোক আছে। জরুরী মীটিঙে বসেছেন হয়তো মিস্টার চৌহান। এ সময় আমাদের মত উটকো ঝামেলা সহ্য না-ও করতে পারেন। এ জন্যেই ঘণ্টার শব্দে কান দেয়নি কেউ।'

এগিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা। পাকা বড় বাড়িটার সামনে প্রায় পৌঁছে গেছে, হঠাৎ কানে এল মাথার ওপরে ডানা ঝাপটানোর শব্দ। চমকে মুখ তুলে তাকাল ওরা। মুহূর্তে বড় বড় এক ঝাঁক কালো রঙের পাখি হামলা চালাল ওদের ওপর।

'উফ্!' চিৎকার করে উঠল কাজল। 'ব্যথা লাগছে! আরে, সর্, সর্ না আমার ওপর থেকে!'

গায়ের ওপর থেকে পাখিগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল দু'জনে। কিন্তু ধারাল নখ আর ঠোঁট দিয়ে ওদেরকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল পাখিগুলো। চোখ বাঁচানোর জন্যে একহাতে চোখ ঢেকে রাখল ওরা, অন্য হাতে থাবা মেরে সরানোর চেষ্টা করল। লাভ হলো না। সরাতে পারল না পাখিগুলোকে। ঠুকরে, আঁচড়ে রক্তাক্ত করতে লাগল ওদের।

আর কোন উপায় না দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচানো শুরু করল দু'জনে, 'বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছো, ভাই!'

কিন্তু পাখির কর্কশ কলরব ঢেকে দিল ওদের চিৎকার। ওদের আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল না কেউ। শেষে মাটিতে গোল হয়ে বসে, বুকের ওপর মুখ গুঁজে দিয়ে দুই হাতে মাথা ঢাকল। তাতে যেন আরও খেপে গেল পাখিগুলো। বিকট চিৎকারে কান ঝালাপালা করে দিয়ে অসহায় অনুপ্রবেশকারীদের ঠুকরে চলল সমানে।

এর মধ্যেই আরেকবার কোনমতে মাথা উঁচু করে, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করে উঠল কাজল।

ওর এই শেষ চিৎকার, নাকি বাড়ির দিক থেকে আসা লোকজনের চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে অবশেষে ঠোকরানো বন্ধ করল পাখিগুলো, বুঝতে পারল না গোয়েন্দারা। কয়েকজন লোক চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এল। উড়ে গেল পাখিগুলো।

গোমড়ামুখো একজন লোক এসে দাঁড়াল গোয়েন্দাদের সামনে। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'এখানে ঢুকেছ কেন?'

কাজল ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল, ওরা মিস্টার চৌহানের প্রতিবেশী। ভেড়ার ফার্মটা ওদের। একটা জরুরী কাজে দেখা করতে এসেছে। 'প্লীজ, আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন!'

'উঁহু, তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না,' রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিল লোকটা। 'তিনি এখন জরুরী মীটিঙে আছেন। ঢুকলে কি করে তোমরা?'

জবাব দিল না দুই গোয়েন্দা। বাকি লোকগুলোকেও এসে দাঁড়াতে দেখল প্রথম লোকটার পেছনে। লোকগুলোর ভাবভঙ্গি মোটেও সুবিধের না। মিস্টার চৌহানের প্রহরীরা ভাল মানুষ নয় কেউ, ভাবল কিশোর।

'পাখিগুলো কার?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কি পাখি? আলফ্রেড হিচককের বার্ডস ছবিতে ছাড়া এমন মারমুখো হয়ে উঠতে তো দেখিনি কোনও পাখিকে!'

'পাখির মালিক?' খেঁকিয়ে উঠল প্রহরীদের দলনেতা। 'ঢুকেছ বেআইনীভাবে, আবার প্রশ্ন করো। সাহস তো কম না। যাও, বেরোও।'

তাড়াতাড়ি কাজল বলল, 'গেটের তালাটা খুলে দিন, প্লীজ!'

'না, দেব না। ঢুকেছ, এখন বেরোও। কিছু করার চেষ্টা করলে বুঝবে মজা। বেরোও।'

যে পথে এসেছিল সেপথে তাড়াহুড়ো করে ফিরে গেল আবার কাজল আর কিশোর। ওদের পেছন পেছন এল লোকগুলো। গেটের তালা খুলল না কেউ। দেয়াল টপকে ঢুকেছিল, আবার সেভাবেই বেরোতে হলো ওদেরকে।

বাড়ি ফিরে চলল দু'জনে। ছোট একটা বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাজল বলল, 'গলাটা শুকিয়ে গেছে। চলো কোক খাই।'

বাজারের একমাত্র পাকা বড় দোকানটার সামনে মোটর সাইকেল থামাল কাজল। দুটো কোক চাইল। দোকানের মালিক মিরণ পোদ্দার বয়স্ক লোক। সে-ই কোকের বোতলের মুখ খুলে এগিয়ে দিল। কাজলকে চেনে।

'কই গেছিলা?' জিজ্ঞেস করল মিরণ।

'হারুণ চৌহানের বাড়িতে,' কোকের বোতলটা ঠোঁটের কাছে ধরে ঢকঢক করে অর্ধেকটা গিলে ফেলল কাজল। 'চেনেন তো তাকে?'

'চিনমু না ক্যান?' হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল মিরণ। 'তবে মনে অয় মানুষ বেশি বালা না। বাড়িত কতগুলি লোক রাখছে, গুণ্ডাপাণ্ডা। মাঝেসাঝে আসে আমার

দোকানে।' একদিন কয়েকজন আইছিল একটা কথা কইতে। ভাল লাগে নাই আমার। বিদায় কইরা দিছি।'

'ভাল লাগেনি কেন আপনার?'

'দেখো বাবা, কিছু মনে কইরো না। কথাগুলান ব্যবসা নিয়া। এর বেশি কিছু জানতে চাইও না।'

চাপাচাপি করল না কাজল। কোকের দাম মিটিয়ে দিয়ে কিশোরকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

মোটর সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার সময় মিরণের ব্যাপারে কাজলকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কাজল বলল, 'এমনিতে লোকটা খারাপ না। কেউ তার ব্যবসার গোপন কথা ফাঁস না করতে চাইতেই পারে। তবে হারুণের লোকগুলোর ওপর কেন সে খাপ্পা, এটা তো বলতে পারত।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'আমার কি মনে হয় জানো? তোমাদের আবদুল ওহাবের কাছে যারা গিয়েছিল, তারাই গেছে মিরণ পোদ্দারের কাছেও। প্রস্তাবটা একই ধরনের হলেও অবাক হব না।'

ছয়

খামারে ফিরল ওরা। হারুণের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করা যায়, ভাবতে লাগল কিশোর। শেষে ফোন করবে ঠিক করল।

ফোন ধরল অন্য লোক। তার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে হারুণের সঙ্গে কথা বলতে চাইল কিশোর। লাইনে থাকতে বলে সেই যে গেল লোকটা, আর আসে না। ধরে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। বেশ কয়েক মিনিট পর খড়খড়ে কণ্ঠে সাড়া পাওয়া গেল ওপাশ থেকে, 'হারুণ চৌহান বলছি। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিতে হবে। যারা চুরি করে দেয়াল টপকে আমার বাড়িতে ঢোকে, তাদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

'কাজল আর আমি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম,' কৈফিয়তের সুরে বলল কিশোর। 'অনেকবার বেলের বোতাম টিপেও যখন সাড়া পেলাম না, ভাবলাম বেল নষ্ট। গেটও বন্ধ। শেষে আর কোন উপায় না দেখে দেয়াল টপকেই ঢুকে পড়লাম। কাজটা ঠিক করিনি। মাপ করে দেবেন।'

'আমার কাছে কি চাও?' কিশোর মাপ চাওয়ার পরেও সুর নরম হলো না লোকটার।

'মজার কিছু তথ্য পেয়েছি আমি, সেগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু টেলিফোনে সেটা সম্ভব না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকার পর জবাব দিল হারুণ, 'তুমি জানো আমি অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকি।'

'জানি। বেশি সময় নষ্ট করব না আপনার। প্লীজ! আপনার সঙ্গে আমাদের কথা বলাটা জরুরী।'

'বেশ, তাহলে আগামী সপ্তায়।'

দমে গেল কিশোর। এতদিন অপেক্ষা করা কঠিন। 'দেখুন, কালকে করা যায় না? খুব জরুরী।'

আবার দীর্ঘ নীরবতা। হারুণ বলল, 'এত তাড়াহুড়া কেন?'

'সেটা সামনাসামনি বলব। আপনি আমাদেরকে কয়েক মিনিট সময় দিন। আগামীকাল, এই ন'টা নাগাদ?'

'ন'টা! এত দেরি! জানো, ছ'টার আগে ঘুম থেকে উঠি আমি। আমার শ্রমিকরা কাজ শুরু করে কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায়।'

'বেশ, তাহলে আপনার যখন সুবিধে হয়।'

নাছোড়বান্দা কিশোরকে এড়াতে না পেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো হারুণ। 'ঠিক আছে, সকাল আটটায়। দেরি করবে না কিন্তু। আটটা মানে আটটা।'

ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। হারুণের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবরটা কাজলকে জানাতে ছুটল।

'রাজি তাহলে পারলে করাতে!' খুশি হলো কাজল। 'আটটা বাজার আগেই গিয়ে বসে থাকব আমরা। যাতে কোন ছুতোয়ই আমাদের খসাতে না পারে। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, লোকটা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে সত্যি রাজি হয়েছে!'

হাসল কিশোর। 'হয়েছে। তার সঙ্গেই কথা বলেছি আমি, কোন সন্দেহ নেই।'

রাতে সেদিন সকাল সকাল শুয়ে পড়ল দু'জনে পরদিন যাতে খুব ভোরে ঘুম ভাঙে। হারুণের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কোনমতেই মিস না হয়।

সকালবেলা আটটা বাজার পনেরো মিনিট আগে হারুণের বাড়িতে পৌছাল ওরা। বেলের বোতাম একবার টিপতেই খুলে দেয়া হলো গেট। বাড়ির সদর দরজা খুলে দিল একজন লোক। জানাল, নাস্তা খেতে বসেছে তার সাহেব। পরস্পরের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর আর কাজল। আগের দিন এত বড় বড় কথা বলেছে হারুণ, ছ'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে এত দেরিতে নাস্তা কেন?

লোকটা ওদের বসিয়ে রেখে চলে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজির হলো খামারের মালিক। হাসলও না। হাতও মেলাল না। বরং গর্জে উঠল, 'তোমাদেরকে আমি ঠিক আটটার সময় আসতে বলেছিলাম। আগে আসতে তো বলিনি।'

কাজল বলল, 'কাজ থাকলে সেরে আসুন না। আমরা বসি।'

কিশোর বুঝে গেছে, ধমক দেয়া, অকারণ চাপে রাখা লোকটার স্বভাব। চুপ করে রইল সে।

কাজলের কথায় রেগে উঠতে গিয়েও উঠল না হারুণ। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন। দীর্ঘ কয়েকটা সেকেন্ড চুপচাপ দেখল দুই কিশোরকে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, অপেক্ষা করা আর লাগবে না। তবে তাড়াতাড়ি শেষ করবে। আমার সময় নেই।'

কোন রকম ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে কিশোর বলল, 'খান সাহেবের কাছে পার্চমেন্টে আঁকা যে ছবিটা আপনি বিক্রি করেছেন, সেটার ব্যাপারে আমরা আগ্রহী। ওটা কি মিয়ানমার থেকে এনেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হারুণ। 'নিলামে কিনেছিলাম।'

'ছবিটা সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

'জানিই না কিছু, কি বলব। দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলাম কিছুদিন। দেখতে দেখতে যখন একঘেয়ে হয়ে গেল, ভাবলাম কেউ কিনতে চাইলে বেচে দেব। খান সাহেব আগ্রহী হলেন। জহুরী জহর চেনে। নিয়ে গিয়ে ভালই করেছেন।'

'আচ্ছা, ছবির ফ্রেম খুলে পেছনটা কখনও দেখেছেন?'

কিশোরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হারুণ। 'না। কেন?'

'আপনার কি একবারও মনে হয়নি ছবিটা কে এঁকেছে, পেছনে তার নামটাম সই করা আছে কিনা, দেখি?'

'না। আছে নাকি? তুমি দেখেছ?'

চট করে কাজলের দিকে তাকাল একবার কিশোর। তারপর জবাব দিল, 'দেখেছি।'

হঠাৎ করেই যেন প্রশ্নবোমা ফাটানো শুরু করে দিল হারুণ, 'ছবিটার ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তোমাদের? গোলমেলে কিছু চোখে পড়েছে নাকি? কিনে এখন আফসোস হচ্ছে খান সাহেবের? ফিরিয়ে দিতে চাইছেন?'

থামল হারুণ। তবে খুব সামান্য সময়, দম নেয়ার জন্যে। তারপর আবার শুরু করল, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি? আমারই বাড়িতে ঢুকে আমাকেই এভাবে জেরা শুরু করেছ কেন তোমরা? নিশ্চয় সেটা জানার অধিকার আমার আছে?'

লোকটার এই হঠাৎ উত্তেজনা অবাক করল কিশোরকে। 'আপত্তিকর কোনও

প্রশ্ন করে থাকলে দুঃখিত।' তার মাথায় ঢুকল না কি এমন খারাপ কথা বলে ফেলেছে সে। 'ছবিটা ছাড়া আর কোন ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই।'

শুনে সাময়িক শান্ত হলো হারুণ।

তার রাগ কমানোর জন্যে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল কাজল, 'আঙ্কেল, আন্টি নেই বাড়িতে?'

'না! বিয়ে করিনি!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হারুণ। বুঝিয়ে দিল, সাক্ষাৎকারের সময় শেষ।

আর কিছু বলার সাহস পেল না কিশোর বা কাজল। আড়ষ্ট পায়ে এগোল সামনের দরজার দিকে। পেছন পেছন এল হারুণ। ওরা বাইরে বেরোতেই দরজা লাগিয়ে দিল দড়াম করে।

গেটের বাইরে এসে স্ট্যান্ড থেকে মোটর সাইকেলটা নামাল কাজল। 'হারুণ ঐ রকম খেপে গেল কেন হঠাৎ বুঝলাম না। শুধু শুধু এসে কষ্ট করলাম। ছবির ব্যাপারে তেমন কিছুই কিন্তু বলল না।'

'আমার মনে হলো, কথা লুকিয়েছে হারুণ চৌহান। অনেক কিছুই জানে সে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'কিন্তু সেগুলো বের করব কিভাবে তার পেট থেকে? আর তার সামনে যেতে পারব না। ওরিব্বাপরে!'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'মোটর সাইকেলটা ওই খেতের কোনায় রাখো। ওই যে সব্জী খেতে কাজ করছে লোকগুলো, ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

সবচেয়ে কাছের লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। একমনে কাজ করে যাচ্ছে লোকটা। মুখ তুলল না। হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কেমন আছেন?'

চুপ করে রইল লোকটা। কিশোরের হাসির জবাবও দিল না, কথার জবাবও দিল না। অবাক লাগল তার। কালা নাকি লোকটা? কানে শোনে না? আবার জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন?'

এবারও জবাব নেই। কাজ করেই চলেছে লোকটা।

জেদ চেপে গেল কাজলের। লোকটার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কানে শোনে না মনে করে কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে ভাই, আপনার নাম কি?'

অবশেষে মুখ তুলল লোকটা। ভাঙা ভাঙা বাংলায় জবাব দিল, 'বাংলা জানি না!'

ওর কথা না বলার রহস্যটা ভেদ হলো এতক্ষণে। লোকটা বার্মিজ।

খানিক দূরে কাজ করছে আরেকটা লোক। তার কাছে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। এই লোকটাও বার্মিজ। প্রথম লোকটার মতই এর কাছেও জবাব

পাওয়া গেল, বাংলা জানে না।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কাজল। 'এখানে তো দেখা যাচ্ছে কথা বলার বড়ই সমস্যা। যে বাংলা জানে, সে কিছু বলতে চায় না, কথা লুকায়। আর যে বলতে চায়, সে বাংলাই জানে না। মিছে কথা বলছে না তো?'

জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে একটা ছেলের দিকে। হাত তুলে দেখাল কাজলকে। 'বুড়োগুলোর মনের হদিস পাওয়া কঠিন। ঘোরপ্যাচ বেশি। বাংলাদেশে থাকে, অথচ একেবারেই বাংলা জানে না, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। চলো, ওই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে দেখি। ও হয়তো মুখ খুলতে পারে।'

গাছের নিচে বসে ছবি আঁকছে একটা ছেলে। বয়েস বছর দশেক হবে। সুন্দর চোখ দুটোতে কিছুটা বার্মিজ ছাপ। ওর সামনে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা।

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ছেলেটা। কিছু বলল না।

'বাংলা জানো?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'কিছু কিছু।'

'কোন ভাষায় কথা বলো তোমরা?'

'বার্মিজ।'

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তাড়াতাড়ি রঙ-তুলি-কাগজ সব লুকিয়ে ফেলে একটা নিড়ানি তুলে নিয়ে ঘাস সাফ করতে লাগল। ফিসফিস করে বলল, 'পালাও!'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা।

ওদের নড়তে না দেখে ইশারা করল ছেলেটা। ফিরে তাকিয়ে ওরা দেখল, হারুণ চৌহান আসছে।

'চলো, চলো!' শঙ্কিত কণ্ঠে বলল কাজল।

কিশোরও দ্বিরুক্তি করল না। মাথা ঝাঁকিয়ে কাজলের কথায় সায় জানিয়ে চৌহান যেদিক থেকে আসছে তার উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করল। অনেক দূর দিয়ে ঘুরে এসে রাস্তায় উঠে মোটর সাইকেলের কাছে পৌঁছল।

ফেরার পথে কিশোর বলল, 'অরুণের এই বার্মিজ বলা একটা অতি মূল্যবান সূত্র দিয়েছে আমাকে।'

'ওর নাম অরুণ, তুমি জানলে কি করে?' কাজল অবাক।

'ওর গেঞ্জিতে নাম লেখা দেখেছি। সব ক'জন শ্রমিকের একই রকম গেঞ্জি পরা, খেয়াল করোনি? গেঞ্জির বুকের কাছে নাম লেখা। সবারই।'

'আমি খেয়ালই করিনি,' সশ্রদ্ধ প্রশংসা কাজলের হাসিতে। 'এ জন্যেই তুমি কিশোর পাশা, গোয়েন্দা; আর আমি কাজল খান, বোকার হদ্দ।'

'অকারণে নিজেকে গালমন্দ করছ। তুমিও বোকা না। এ সব কাজে

অভিজ্ঞতা কম।'

কাজলদের খামারে ঢুকেই মামাকে ফোন করতে ছুটল কিশোর।

'কি খবর তোর, কিশোর?' আরিফ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন। 'তোর তদন্ত কদ্দূর?'

'খুব একটা এগোতে পারিনি,' কিশোর বলল। 'একটা কাজ করতে পারবে, মামা?'

'বলে ফেল।'

'ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে জানতে পারবে ওদের বছর দশেক আগের ফাইলে হারুণ চৌহান নামে কোন লোকের বাংলাদেশে ঢোকার রেকর্ড আছে কিনা? লোকটার সম্ভবত মায়ানমারের নাগরিকত্বও আছে।'

এ ক'দিনে তদন্ত করে যা যা জেনেছে মামাকে জানাল কিশোর।

'অনেকখানিই তো এগিয়েছিস। পারিনি বলছিস কেন?' আরিফ সাহেব বললেন। 'ঠিক আছে, ইমিগ্রেশনে খোঁজ নিচ্ছি আমি। জানাব তোকে।'

সাত

ফোন শেষে আবার রহস্যময় ছবিটা নিয়ে বসল কিশোর আর কাজল। খানিকক্ষণ মাথা ঘামাল দু'জনে। হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল কিশোরের চোখ, 'কাজল, একটা কথা ভাবছি আমি!'

মুখ তুলে তাকাল কাজল।

'আমার মনে হয়,' কিশোর বলল, 'ছবিটার ব্যাপারে যা যা বলেছে তারচেয়ে অনেক বেশি জানে হারুণ। ছবির পেছনে লেখা ইংরেজি "এ" অক্ষরটা অরুণ নামের আদ্যক্ষর।'

কুঁচকে গেল কাজলের ভুরু। 'তুমি বলতে চাও, ছবির এই বাচ্চাটিই বড় হয়ে কাজ করছে এখন হারুণের খামারে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ভাবনাটা হয়তো অদ্ভুত। কিন্তু অসম্ভব না।'

'অদ্ভুত তাতে কোন সন্দেহ নেই,' কাজল বলল। 'কিন্তু তোমার অদ্ভুত ভাবনার ওপরও আমার বিশ্বাস জন্মে গেছে।'

ঘরে ঢুকলেন খান সাহেব। কিশোরের নতুন ধারণাটার কথা জানানো হলো তাঁকে। হাসলেন তিনি। তবে সম্ভাবনাটা যে উড়িয়ে দেয়া যায় না, এ কথাও স্বীকার করলেন।

কাজল বলল, 'ছবিতে পেছন ফিরে আছে যে লোকটা, সে অরুণের বাবা না

তো? কিন্তু পেছন ফিরে আছে কেন সে? আর্টিস্ট কি তার মুখের দিকে তাকাতে লজ্জা পাচ্ছিল?'

'কিংবা দুঃখ পাচ্ছিল,' জবাব দিলেন খান সাহেব। 'অথবা লোকটাকে পছন্দ করে না আর্টিস্ট, তাই এ ভাবে পেছন ফিরিয়ে রেখে নিজের ঘৃণার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, শিল্পী চায়নি চেহারা দেখে মানুষ তাকে চিনে ফেলুক।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'আর কিছু আন্দাজ করতে পারছ?'

'আপাতত না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে অরুণ আর হারুণ চৌহান সম্পর্কে বিস্তারিত আরও জানা দরকার।'

খান সাহেব জানালেন, অরুণকে সবাই হারুণের ভাতিজা বলেই জানে। ছেলেটার বাবা-মা নেই, মারা গেছে।

'এ থেকে আরেকটা জিনিস অনুমান করতে পারছি,' কিশোর বলল। 'শেষ ছবিটাতে দেখানো হয়েছে একটা নৌকাকে গুঁতো মেরেছে একটা স্টীমার। হতে পারে, ওই বোট অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছে অরুণের বাবা-মা।'

'তোমার অনুমানটা উড়িয়ে দেয়া যায় না,' খান সাহেব বললেন। 'একটা কথা ভাবছি, ছেলেটাকে বৈধভাবে দত্তক নিয়েছেন তো চৌহান?'

'জানার জন্যে হয়তো মায়ানমারেই যেতে হবে,' হাসল কাজল। 'কিশোর, ক্রমেই কিন্তু কাছিয়ে আসছে দেশটা। শেষ পর্যন্ত ওখানেই না পাড়ি জমাতে হয় আমাদের।'

'লাগলে তো যাবই,' কিশোর বলল। 'কিন্তু মনে হয় না যাওয়া লাগবে। আশা করি এখানে, এই ভেড়ার খামারে বসেই কাহিনীর ইতি টানতে পারব আমি।'

কাজল আর তার বাবা, দু'জনেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে। কাজল বলল, 'কিশোর, কিছু একটা আছে তোমার মনে, অদ্ভুত আরও কোন ভাবনা। কি, ঠিক বলিনি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'বলেছ। সত্যিই আরেকটা অদ্ভুত ভাবনা মাথায় ঘুরছে আমার। নিলাম থেকে হারুণের ছবি কেনার কথাটা সত্যি বলে মেনে নিতে পারছি না আমি। বেচারা অরুণের কথাও ভাবছি। ছবি আঁকায় দারুণ হাত ওর। একই রকম হাত পার্চমেন্টে আঁকা ছবিগুলোর আর্টিস্টেরও, যার নামের আদ্যাক্ষর লেখা রয়েছে ছবির পেছনে। আমার বিশ্বাস, ওই আর্টিস্টের সঙ্গে অরুণের রক্তের সম্পর্ক আছে। ওর পুরো নাম জানেন, আঙ্কেল? পদবীটা?'

'না,' খান সাহেব বললেন। 'তবে হারুণ চৌহানের আপন ভাতিজা হলে ওর পদবীও চৌহানই হবে। "এস সি" দিয়ে কি হয় জানাটা এখন সত্যি জরুরী। ওটা কোন ব্যক্তির নামের আদ্যাক্ষর না হয়ে কোন আর্ট স্কুল, মিউজিয়াম কিংবা যে ডিলার ওটা বিক্রি করেছে, তার নামের আদ্যাক্ষরও হতে পারে।'

আরও দু'চারটা কথা বলে উঠে চলে গেলেন খান সাহেব।

কাজল জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করব?'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'এক কাজ করা যাক। চলো ওহাব বুড়োর সঙ্গে কথা বলে আসি। সেদিন যে লোকগুলো ওকে পিটিয়ে বেহুঁশ করেছিল, ওরা আর এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করব। চৌহানের ব্যাপারেও কিছু জানা থাকতে পারে তার।'

'ভাল বুদ্ধি। ঠিক আছে, চলো।'

ঝুপড়ির সামনে গাছের শিকড়ে বসে থাকতে দেখা গেল ওহাবকে। চারপাশে ভেড়ার পাল। কোনটা চরছে, কোনটা শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। বুড়োর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর একটা ভেড়ার ছানা। ওটাকে আদর করছে সে। বিড়বিড় করে কথা বলছে।

গোয়েন্দাদের দেখে খুশি হলো ওহাব। 'আসো, আসো। মনে হইতাছিল তোমরা আইজ দেখা করতে আসবাই।'

হাসল কিশোর। বাচ্চাটাকে দেখাল। 'কি কথা বলছিলেন?'

'ওর লগে না, আমার পীরের লগে,' ওহাব বলল। 'হুজুরে আমারে উপদেশ দিতাছিলেন। সেইড়াই মুখস্থ করতাছিলাম।'

'কই, কোথায় আপনার পীর?' অবাক হয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। কাউকে দেখতে পেল না। অথচ দূর থেকে স্পষ্ট দেখেছে, কারও সঙ্গে কথা বলছিল বুড়ো। ওরা ভেবেছে বাচ্চাটার সঙ্গে বলছে।

'তিনি তো দুনিয়ায় নাই। আড়াল হইয়া গেছেন,' শ্রদ্ধাভরে আকাশের দিকে আঙুল তুলল ওহাব। মাথাটা সামান্য নুইয়ে সালামের ভঙ্গি করল।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি উপদেশ দিচ্ছিলেন আপনার পীর?'

'তিনি কইলেন: দেখো ব্যাটা, কেউ যদি তোমার কাছে জরুরী কিছু কইতে আসে, মন দিয়া শুনবা। বলা তো যায় না কিসের মদ্যে কি লুকাইয়া আছে।'

'আমার মধ্যে অন্তত কিছু নেই,' হাত নেড়ে বলে দিল কাজল। 'তবে ওহাবচাচা, তোমার সঙ্গে যে জরুরী কথা বলতে এসেছি, সেটা ঠিক।'

'বইলা ফালাও।'

'সেই গুণ্ডা দুটো কি আবার এসেছিল?'

'না।'

ওদের ব্যাপারে এখনও কথা বলতে নারাজ কিনা বুড়ো, জানতে চাইল কিশোর।

'শুধু আমার নিজের কথা হইলে ভয় পাইতাম না,' ওহাব বলল, 'বইলা ফালাইতাম। কিন্তু আমি কইলে অনেক ভুলাভালা মানুষ বিপদে পড়ব।'

চৌহানের কথা জানতে চাইল তখন কিশোর।

খান সাহেব যা যা বলেছেন, সেটারই পুনরাবৃত্তি করল ওহাব। সেইসঙ্গে যোগ করল, 'আর কিছু জানি না আমি। বদমেজাজী লোকডার লগে কতা কইতেও ডর

লাগে। অর একটা কামলাও বাংলা জানে না। বর্মী কতা কয়। মানুষগুলানরে খাডাইতে খাডাইতে জান বাইর কইরা ফালায়। লোকডার দিলে দয়ামায়া বলতে কিছু নাই। ছোট্ট পোলাডা যে থাহে অর বাড়িত, খামাখা খামাখা ওইডারে ধইরা পিডায়। মাইনষেরে কয় পোলাডা অর ভাতিজা, আমি বিশ্বাস করি না। পোলাডার লগে চেহারারও মিল নাই। বর্মী বর্মী চেহারা পোলাডার।'

'ওইটুকুন ছেলেকে মারে? লোকটা আসলেই খুব খারাপ,' কিশোর বলল।

আর বিশেষ কিছু জানাতে পারল না ওহাব। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারণভূমির দিকে এগোল দুই গোয়েন্দা। অনেকগুলো ভেড়া চরছে ওখানে। বিশাল একটা মর্দা ভেড়া দেখিয়ে কিশোরকে বলল কাজল, 'ভীষণ বদমেজাজী ওটা। আমরা ওকে এড়িয়ে চলি।'

হাঁটা থামাল না ওরা। তবে একটা চোখ রেখেছে ভেড়াটার ওপর। ভেড়াটাও কুটিল চোখে দেখতে লাগল ওদের। মাথা ঝাড়া দিল। বড় বড় বাঁকানো শিং দুটো নামিয়ে আচমকা ছুটে আসতে শুরু করল ওদের দিকে।

'আরে, সত্যিই গুঁতো মারতে আসছে দেখি!' চেঁচিয়ে উঠল কাজল, 'কিশোর, দৌড় দাও! দৌড়!'

ঝেড়ে দৌড় দিল দু'জনে। ভেড়াটার গতি ওদের চেয়ে দ্রুত। আগে আগে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওরা। হঠাৎ ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর। খামারের নয়। বাইরে থেকে ঢুকেছে।

'এবার থামবে,' আশা করল কিশোর।

'কুকুরকে ভয় পায় না ওটা,' কাজল বলল। 'একটা বাঘা কুত্তাকে একদিন গুঁতিয়ে মেরেই ফেলেছিল আরেকটু হলে।'

কিভাবে বাঁচা যায়, ছুটতে ছুটতে ভাবছে কিশোর। কোন উপায় দেখতে পেল না।

বিপদের ওপর বিপদ। কুকুরের চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে বড় একটা ভেড়া ছুটে এসে পড়ল একেবারে কিশোরের সামনে। লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। পা বেধে উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে।

কাছে চলে এল বদমেজাজী ভেড়াটা। বাঁকা শিংওয়ালা মাথাটা পেটের নিচ দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, টের পেল কিশোর।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে তার মগজে। কি করবে ভেড়াটা? ওকেও বাঘা কুকুরটার মত শূন্যে ছুঁড়ে দেবে? নাকি গুঁতিয়ে পাঁজর ভাঙবে?

শূন্যে ছুঁড়ে দেয়ারই মতলব করেছে ভেড়াটা। মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর। টারজান হলে এখন দুই হাতে দুই শিং চেপে ধরে লড়াই শুরু করে দিত। কিন্তু সে টারজান নয়। লড়াইয়ের চেষ্টাও করল না। বরং দুই হাতে একটা শিং চেপে ধরে ঝুলে পড়ল।

ভীষণ রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকল ভেড়া। প্রচণ্ড জোরে ঝাড়া মেরে মেরে কিশোরকে শিং থেকে ছুটানোর চেষ্টা করতে লাগল। নাড়া খেয়ে একবার এদিকে যাচ্ছে কিশোরের দেহ, একবার ওদিকে। কিন্তু শিং ছাড়ল না সে।

ভেড়াটা ওকে ছুটানোর চেষ্টা করে করে এক সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। ক্লান্ত, নাকি পরাজিত? জবাবটা যা-ই হোক, সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কিশোর। সতর্ক চোখ রাখল বদমেজাজী প্রাণীটার ওপর।

দৌড়ে এল কাজল। 'বলেছিলাম না সাংঘাতিক শয়তান!'

কিন্তু শয়তান হলেও কাজলকে চেনে প্রাণীটা। তাই ওকে আক্রমণের চেষ্টা করল না। পেছনে থাবা মেরে ওটাকে তাড়িয়ে দিল কাজল।

মনে হলো গেছে, কিন্তু গেল না ভেড়াটা। মেজাজ এখনও খাট্টা হয়ে আছে। কিছুদূর গিয়েই ঘুরে আবার শিং বাগিয়ে তেড়ে এল। ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ আদেশের সুর চাবুকের মত শপাং করে আছড়ে পড়ল যেন।

আবদুল ওহাবের ধমক খেয়ে থমকে দাঁড়াল ভেড়াটা। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর আবার আসতে শুরু করল। একটা আজব কাণ্ড ঘটল এই সময়। সুরেলা উদাত্ত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল ওহাব। আধ্যাত্মিক গান। গানের সুর মুহূর্তে বিস্ময়কর ক্রিয়া করল ভেড়াগুলোর ওপর। প্রভাবিত হয়ে পড়ল ওগুলো। পাজি ভেড়াটা দাঁড়িয়ে গেল রাগ ভুলে গিয়ে। অন্য ভেড়াগুলোও খাওয়া ভুলে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল গায়কের দিকে। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়তে লাগল বাচ্চাগুলো।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। বাজনার সুর ভেড়াকে প্রভাবিত করেছে, ইয়োরোপিয়ান রাখালদের কাছে শুনেছে সে। কিন্তু গানও যে ওদের প্রিয়, এই প্রথম দেখল।

পাজি ভেড়াটাকে থামিয়ে দিয়ে বাঁচানোর জন্যে ওহাবকে ধন্যবাদ দিল কিশোর।

হাসল ওহাব। 'সবই আল্লাহর ইচ্ছা! আমার হুজুরে কইতেন: সব সময় গান গাইবা। গানের সুর অতিবড় পাষণ্ডের দিলেও রহম পয়দা করে।'

কথাটা অস্বীকার করতে পারল না কিশোর। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কাজলের সঙ্গে বাড়ি রওনা হলো।

আট

চিন্তিত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। কাজলের দিকে তাকাল। 'এমন কাউকে চেনো, যে বার্মিজ জানে?'

'চিনি। কেন?'

'তাকে আসতে বলতে পারবে? হারুণের খামারের লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলাতাম।'

হেসে উঠল কাজল। 'আবার চালু হয়ে গেছে গোয়েন্দা মগজ। ভেড়ার সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনাটা এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেলে? হ্যাঁ, পারব। আমি বললেই চলে আসবে তরিক। ওই যে বলেছিলাম, আমার বন্ধু।'

বাড়ি ফিরেই তরিককে ফোন করল কাজল। বাড়িতেই পাওয়া গেল ওকে। সামনে পরীক্ষা। পড়ায় ব্যস্ত। তরিক বলল, 'কোনমতে পারি আর কি। বার্মায় গিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকেছিলাম কিছুদিন। দু'চারটা শব্দ তখনই শিখেছি।'

'কাজ চালাতে পারবে তো?'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

'তা ঠিক। কখন আসতে পারবে তুমি?'

'আগামী কাল হলে চলবে?'

কিশোরকে জিজ্ঞেস করল কাজল। তারপর তরিকের কথার জবাব দিল, 'চলবে।'

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ কাজলদের বাড়িতে হাজির হয়ে গেল তরিক। লম্বা ছেলেটাকে একনজরেই পছন্দ হয়ে গেল কিশোরের। কিশোরকেও পছন্দ করল তরিক। বন্ধুত্ব হতে দেরি হলো না।

তরিককে নিয়ে হারুণের খামারে গেল আবার কিশোর আর কাজল। তরকারীর খেতে কর্মরত বর্মী লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা চালাল তরিক। যদিও বর্মী শব্দের ভাণ্ডার খুবই কম তরিকের, কিন্তু তার কথা বুঝল না লোকগুলো, এটা বলা যাবে না।

অরুণের সঙ্গেও দেখা হলো ওদের। আগেরবারের মতই এবারও আগ্রহ নিয়ে কথা বলল সে। জানা গেল, সেদিন কিশোর আর কাজলের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে তাকে অনেক মেরেছে তার চাচা। ছবি আঁকার সমস্ত সরঞ্জাম নষ্ট করে দিয়েছে। কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখ মুছতে মুছতে অরুণ জানাল, জিনিসগুলো তাকে একজন বর্মী শ্রমিক কিনে দিয়েছিল।

ভাগ্য খারাপ অরুণের, সেদিনও কিশোরদের সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখে ফেলল হারুণ। তেড়ে এল। শাসাতে লাগল গোয়েন্দাদের। বেরিয়ে যেতে বলল। হুমকি দিল, আবার যদি কোনদিন ওদের এখানে ঢুকতে দেখে সে, ভাল হবে না।

হারুণের ব্যবহারে কিশোর আর কাজলের মত তরিকও খেপে গেল তার ওপর। কিশোরদেরকে তদন্ত চালিয়ে যেতে বলল সে। সাধ্যমত ওদের সহায়তা করে যাবে সে।

বাড়ি ফিরে এল কিশোর ও কাজল। এরপর কি করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনায় বসল। কাজল বলল, 'আরিফ-আঙ্কেল যে বলেছিলেন, অসীম দেবনাথের সাহায্য নিতে। তাঁকে একবার ফোন করে দেখলে কেমন হয়?'

'কি লাভ? মামা বলেছিল, তাঁর কাছে ছবির ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ছবি রহস্যের সমাধান তো মোটামুটি করেই ফেলেছি আমরা।'

'হুঁ। তা-ও তো বটে। তাহলে কি করবে এখন? আর কোন কাজ না থাকলে চলো, ভেড়ার বাচ্চাগুলোর দেখাশোনা করিগে।'

'তা-ই চলো। কাজ করতে করতে ভাবব।'

দুপুরের খাওয়ার পর আবার বেরোল ওরা। মোটর সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে ওদের খামার দেখাল কিশোরকে কাজল।

কেটে গেল দিনটা। কিশোরের মনে হলো ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। কখন যে শুতে যাবার সময় হয়ে এল, টেরই পেল না। বাতি নিভিয়ে দিল কাজল। নিঝুম হয়ে এল পুরো বাড়িটা।

কাজল ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কিশোর জেগে রইল। কিছুতেই ঘুম আসছে না তার। রহস্যটা নিয়ে ভাবছে। বার বার ভাবনাটা চলে যাচ্ছে অরুণের দিকে। কেবলই মনে হচ্ছে ছেলেটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হারুণের কাছ থেকে সরানো দরকার। নইলে কোনদিন মারতে মারতে মেরেই ফেলে নিষ্ঠুর লোকটা, কে জানে।

যতই ভাবছে, ঘুম ততই দূরে সরে যাচ্ছে। নাহ্, এ ভাবে গড়াগড়ি করে লাভ নেই। শেষে 'ধ্যাত্তোর!' বলে উঠেই পড়ল বিছানা ছেড়ে। স্যান্ডেল জোড়া পায়ে গলিয়ে টেবিলের ওপর রাখা টর্চটা তুলে নিয়ে নিচতলায় চলল। ছবিটা দেখবে। দেখে বোঝার চেষ্টা করবে নতুন কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা।

কাউকে বিরক্ত না করে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে। হলঘরে এসে সুইচ টেপার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, এই সময় আলো চোখে পড়ল। পাতলা একফালি আলো নড়ে বেড়াচ্ছে ঘরে। কাউকে চোখে পড়ল না। কিন্তু কারও হাতে না থাকলে আলোটা ওভাবে নড়তেও পারত না।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবশেষে আলোর আড়ালে আবছা মানুষটার অবয়ব অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল তার। আলোটা পেনলাইটের। লোকটার হাতে ধরা। অবশেষে আলোর নড়া বন্ধ হলো। স্থির হলো পার্চমেন্টে আঁকা ছবির ওপর।

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে কিশোরের। বাড়ির কেউ? তাহলে চুরি করে এ ভাবে টর্চ জ্বেলে ছবি দেখতে আসবে কেন? তারমানে চোর। তার সন্দেহ প্রমাণিত হলো যখন ওপর দিকে তুলে ধরা টর্চের আলো নড়ে উঠে ক্ষণিকের জন্যে লোকটার মুখটা চোখে পড়ে গেল তার। নাইলনের মোজা মাথার ওপর দিয়ে টেনে

মুখের ওপর দিয়েছে। চেহারা চিনতে না দেয়ার সহজ কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থা।

পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। নিঃশ্বাসও ফেলছে না। আচমকা হাত বাড়িয়ে ছবিটা নামিয়ে আনল আগন্তুক।

আর চুপ করে থাকা যায় না। চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'ও কি! ছবি নিচ্ছেন কেন?'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। ছবিটা ছুঁড়ে মারল কিশোরকে সই করে। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল কিশোর। অল্পের জন্যে মুখে লাগল না। দরজায় গিয়ে বাড়ি খেল। ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

মরিয়া হয়ে আলোর সুইচটা হাতড়াতে শুরু করল কিশোর। পাচ্ছে না কিছুতেই। ঠিক তার মুখ সই করে টর্চের আলো ফেলল লোকটা। চোখে আলো ফেলে অন্ধ করে দিল কিশোরকে।

লাফিয়ে উঠল চোরটা। দৌড়ে এল। নিচু হয়ে তুলে নিল ছবিটা। সামনের দরজার দিকে ছুটল।

'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করে উঠল কিশোর। লোকটার শার্ট খামচে ধরল। কিন্তু রাখতে পারল না। হ্যাঁচকা টানে তার হাতটা ছুটিয়ে একদৌড়ে বাইরে চলে গেল লোকটা।

তাড়া করল কিশোর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে 'চোর চোর' বলে। উত্তেজিত কথা শোনা গেল। আলো জ্বলে উঠতে লাগল একের পর এক। দৌড়ে ঘর থেকে বাইরে বেরোল কিশোর। কিন্তু চোরটাকে দেখল না কোথাও।

আশফাক সাহেব, তাঁর স্ত্রী, কাজল, বাড়ির আরও লোকজন উঠে চলে এল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও চোরের দেখা পাওয়া গেল না।

নয়

পরদিন সকালে খবর পেয়ে পুলিশ এল। ঘুরেফিরে দেখল সব। কোন সূত্র পেল না। পুলিশ আসার আগেই খোঁজাখুঁজি করেছে কিশোরও। সে-ও কিছু পায়নি। চোরটা কে বা কোথা থেকে এসেছে কিছুই জানা গেল না।

সারাটা দিন নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করল সে আর কাজল মিলে। হারুণের খামারের কাছ থেকেও ঘুরে এল একবার। মাঠে অরুণকে দেখল না। বাড়ি থেকে বোধহয় বেরোতে দেয়নি হারুণ।

ছেলেটার জন্যে দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল কিশোরের।

বাড়ি ফিরে এলে কাজলের আম্মা বললেন, 'কিশোর, তোমার মামা ফোন

করেছিলেন। তোমাকে বলতে বলেছেন বাড়ি এসেই যেন ফোন করো। জরুরী খবর আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ফোন করল কিশোর। আরিফ সাহেবই ধরলেন। কিশোর কেমন আছে, তদন্তের অগ্রগতি কি রকম, জানতে চাইলেন। তারপর বললেন, 'তোর মামী তো তোর জন্যে অস্থির হয়ে আছে। তোদের বিপদের ভয়ে।'

হাসল কিশোর। 'না, কি আর বিপদ। মামীকে বোলো আমি ভালই আছি। জরুরী খবর আছে নাকি বলেছিলেন?'

'ইমিগ্রেশনে খবর নিয়েছি,' আরিফ সাহেব বললেন। 'বছর দশেক আগে মায়ানমার থেকে হারুণ চৌহান নামে কোন লোকের বাংলাদেশে আসার রেকর্ড নেই ওদের খাতায়।'

'সে আমি জানতাম,' বিন্দুমাত্র হতাশ হলো না কিশোর, 'বরং এটাই আশা করেছিলাম। শিশু অরুণকে নিয়ে চোরাপথে বেআইনীভাবে বাংলাদেশে ঢুকেছে হারুণ। তার বার্মিজ শ্রমিক আর সহকারীরাও একই ভাবে ঢুকেছে।'

'হুঁ,' আরিফ সাহেব বললেন, 'কিন্তু কোন প্রমাণ ছাড়া তো ধরা যাবে না লোকটাকে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। নতুন কোন অগ্রগতি হলে জানাস আমাকে।'

'নতুন আরেকটা খবর আছে,' কিশোর বলল। 'ছবিতে আরেকটা নামের আদ্যক্ষর পাওয়া গেছে। এস সি। পুরো নামটা কি হবে জানি না। তবে হারুণের সঙ্গে জড়িত কারও কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের নাম হতে পারে। আরেকবার খোঁজ নিতে পারবে ইমিগ্রেশনে? এস সি নামটা যদি কোন মানুষের হয়, তাহলে জানতে হবে মায়ানমার থেকে ওই নামের কেউ দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ঢুকেছিল কিনা। কিংবা এখনও বাস করে কিনা। হারুণ চৌহানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। পারবে?'

'চেষ্টা করব,' আরিফ সাহেব বললেন। 'মায়ানমারেও লোক আছে আমার। সেখানেও খোঁজ নেব। দেখা যাক, কোনখান থেকে কি খবর বেরোয়। এখন তোর জন্যে আরেকটা চমক আছে। সেই যে মহিলাকে তোরা তাড়া করেছিলি না, যে জিনার জ্যাকেটটা নিয়ে পালাচ্ছিল, তাকে ধরেছে পুলিশ। সব স্বীকার করেছে সে। হারুণের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণ চোর। স্বামী পঙ্গু হয়ে ঘরে পড়ে আছে। লেখাপড়া বিশেষ জানে না। চাকরি-বাকরি জোগাড় করতে পারেনি। শিশু সন্তান আর নিজেদের খাবার জোগাড়ের জন্যে শেষে এক পরিচিত ড্রাইভারকে হাত করে চুরি শুরু করেছে। ভদ্র পোশাক পরে থাকে। যাতে মানুষ তাকে সন্দেহ না করে। দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছিল।'

'হুঁ! দুঃখই লাগছে মহিলার জন্যে। এক কাজ করো না,' কিশোর বলল, 'কেসটা তুলে নাও না মহিলার ওপর থেকে।'

হাসলেন আরিফ সাহেব। 'তোর কি মনে হয়? এত কথা শোনার পর জেল খাটাব আমি মহিলাকে? বরং আমার এক বন্ধুকে বলে তার কারখানায় মহিলার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি।'

'খুব ভাল করেছো, মামা,' খুশি হলো কিশোর। 'রাখি তাহলে এখন?'

'আচ্ছা। খবর পেলেই জানাব তোকে।'

'আর মামীকে চিন্তা করতে মানা কোরো।'

'করলেই কি আর শোনে। আচ্ছা, রাখলাম।'

কিশোর যখন কথা বলছে, কাজল তখন গেছে তার ভেড়ার বাচ্চাগুলোর পরিচর্যা করতে। বসে বসে ভাবতে লাগল কিশোর। ঘরে ঢুকলেন খান সাহেব। 'কি ব্যাপার? ফোনটা তোমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মনে হচ্ছে?'

মামার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, খান সাহেবকে জানাল কিশোর।

'কি করবে এখন?' সব শোনার পর জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কিছু বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'সূত্র যা যা ছিল, সব শেষ। দেয়ালে এসে ঠেকেছি। কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি, হারুণ চৌহানের সঙ্গে এই রহস্যের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু সেটা প্রমাণ করব কিভাবে?'

'দেখো, কি হয়। চিন্তা করে লাভ হবে না। সময়ই সুযোগ এনে দেবে। আমি যাই। ফ্যাক্টরিতে কাজ আছে।'

কিশোরও বেরোল। কাজল কি করছে দেখতে গেল। ভেড়া নিয়ে ব্যস্ত কাজল। তাকে আর টানল না কিশোর। কাজ করছে করুক। সে চলল ওহাবের সঙ্গে দেখা করতে।

ওখানেও সুবিধে হলো না। ওহাব তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে তার পীরের সঙ্গে কথা বলছে।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফিরে এল কিশোর। এবং তারপর থেকেই ঘটতে শুরু করল ঘটনা। ঘরে ঢুকেই ফোন বাজতে শুনল সে। ধরল গিয়ে। ভেসে এল তরিকের উত্তেজিত গলা, 'কে, কাজল?'

'আমি কিশোর।'

'একটা খবর আছে। অরুণ পালিয়েছে।'

মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোরও। 'তুমি কি করে জানলে?'

'আমার বর্মী ভাষা ঝালাই করার জন্যে আবার গিয়েছিলাম হারুণ চৌহানের খামারে। মাঠের লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলার জন্যে। ওখানেই শুনে এলাম।'

'সত্যি পালিয়েছে? হারুণ ওকে মেরেটেরে ফেলেনি তো?'

'কি করে বলব?' জবাব দিল তরিক। 'তবে সে যে বাড়ি নেই, এটুক শিওর।'

'বড়ই চিন্তার বিষয়। খোঁজ লাগাতে হয়।'

'লাগাও। আমার কোন সাহায্য দরকার হলে ফোন কোরো।'

'করব.' বলে তরিককে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। ছুটে বেরোল বাইরে। সোজা চলে এল কাজলের কাছে। তাকে দুঃসংবাদটা জানাল। শুনে কাজলও চিন্তিত হয়ে পড়ল। ন্যাকড়া দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'চলো, আব্বাকে গিয়ে জানাই।'

খোঁয়াড় থেকে বেরোল দু'জনে। ফ্যাক্টরির দিকে এগোল। এই সময় ছুটে আসতে দেখল ওহাবকে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তোমরা এইখানে। তোমাদের কাছেই আসতাছিলাম। সাংঘাতিক একটা খবর আছে।'

'কি খবর?' ভুরু কুঁচকাল কাজল।

এদিক ওদিক তাকাল ওহাব। কাছেপিঠে আর কেউ আছে কিনা দেখে নিল। তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'পোলাডা পলাইয়া আমগো খামারেই আইয়া ঢুইকা পড়ছে!'

'কোন ছেলেটা?' কাজল অবাক।

'আরে ওই পোলাডা। হারুণ যারে ভাতিজা কয় আর মারে। মাইর সইহ্য করতে না পাইরা পলাইছিল। আমগো খামারে জঙ্গলের মধ্যে বইয়া বইয়া কানতাছিল। আমি আমার হুজুরের লগে কতা কইতাছিলাম। না অইলে অনেক আগেই অর ফোঁপানির শব্দ শুনতাম। গিয়া দেখি মুখচোক শুকাইয়া গেছে পোলাডার।'

'তারমানে আমি যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম,' ওহাবকে বলল কিশোর, 'তখন ও ঝোপের মধ্যেই বসেছিল!'

'কোথায় এখন ও?' চিৎকার করে উঠল কাজল। উত্তেজনা সহ্য করতে পারছে না।

'আমার ঘরে লুকাইয়া রাখছি।'

'খুব ভাল করেছ। চলো চলো।'

ওহাবের ঝুপড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল কাজল আর কিশোর।

দশ

সেদিনই আবার ফোন করলেন আরিফ সাহেব। 'তোর কথামত খোঁজ নিয়েছিলাম। এস সি কার নামের আদ্যক্ষর, শুনলে চমকে যাবি। সু চি চৌহান নামে এক মহিলা। বোট অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল তার স্বামী। এর কয়েকদিন পরেই রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় তার শিশুপুত্র।'

'বলো কি! খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সব!' টেলিফোনেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'কোথায় এখন মহিলা? তাঁকে আসতে বলা যায় না? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব?'

'আরে আস্তে, আস্তে,' হাসি শোনা গেল আরিফ সাহেবের। 'কানের কাছে বোমা ফাটানো শুরু করলি যে। ভুলে যাচ্ছিস কেন, বহুকাল পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেছি আমি। গোয়েন্দাগিরি আর তদন্তের কাজ আমিও করেছি। হ্যাঁ, মহিলাকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি আমি ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে। যে কোন সময় চলে আসতে পারেন। রেডি থাকিস। তোর কি মনে হয়, ওই মহিলাই অরুণের মা?'

'নিশ্চয়ই!' কিশোর বলল। 'তাতে কোন সন্দেহ আছে নাকি? তারমানে ওই মহিলা শিল্পী। ছবিটা তিনিই এঁকেছেন। বোট অ্যাক্সিডেন্টে শুধু তাঁর স্বামী, অর্থাৎ অরুণের বাবাই মারা গেছেন, যাঁর মুখটা আড়াল করে এঁকেছেন সু চি।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা। এখন তাহলে কি করবি?'

'এই রহস্যের যবনিকাপাত করব, আরকি। খান আঙ্কেলকে বলব, পুলিশে খবর দিতে। সু চি চৌহান জয়দেবপুরে পৌঁছলেই যাতে আসল অপরাধীকে পাকড়াও করে ফেলা যায়। হ্যাঁ, মুসা, রবিন আর জিনাকে নিয়ে তুমিও চলে এসো।'

কিশোরের পাশে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে কাজল। কিশোর রিসিভার নামাতেই প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল সে।

সব কথা তাকে খুলে বলল কিশোর।

'মিসেস চৌহান এলেই এখন সব রহস্যের সমাধান করে ফেলা যায়,' কাজল বলল। 'কিন্তু কবে আসবেন তিনি?'

এগারো

পরের দিন সন্ধ্যায়ই দলবল নিয়ে কাজলদের ডেড়ার খামারে হাজির হলেন আরিফ সাহেব। দলবল বলতে মুসা, রবিন, জিনা সবাই আছে। রাফিয়ান আসতে পারেনি। কি জানি খেয়েছে, ফুড পয়জনিং হয়ে গেছে তার। পশু হাসপাতালে রেখে আসতে হয়েছে। সেজন্যে জিনার মন খারাপ।

হাসিমুখে আরও একজন নামল গাড়ি থেকে। সুদর্শন এক যুবক। সাংবাদিক সেলিম শাহেদ।

হাতটা বাড়িয়ে দিল কাজল 'সেলিমভাই, তুমিও এসেছ! খুশি হলাম।'

'আঙ্কেলের বাড়িতে গিয়েছিলাম,' আরিফ সাহেবের কথা বলল সেলিম। 'তোমাদের খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখলাম, জয়দেবপুর রওনা দিচ্ছে সবাই। আমি কি আর না এসে পারি?'

'খুব ভাল করেছ,' সেলিমের হাত ধরে আন্তরিক ভঙ্গিতে ঝাঁকিয়ে দিল কাজল।

চমকে দেয়ার মত ব্যাপার হলো, আরিফ সাহেবের সঙ্গে সু চি চৌহানও এসেছেন। খবর পেয়ে আর দেরি করেননি। পরের ফ্লাইটেই ঢাকা। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা আরিফ সাহেবের বাড়ি। তিনি আসার পর আরিফ সাহেবও দেরি করেননি। ঘণ্টাখানেক পরেই রওনা হয়ে গেছেন জয়দেবপুরের উদ্দেশে।

ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'কোথায় অরুণ? কোথায় আমার সোনা!'

হাত ধরে তাঁকে সোফায় বসালেন কাজলের আম্মা। শান্ত হতে বললেন।

কিন্তু সহ্য হচ্ছে না মিসেস চৌহানের। 'প্লীজ, কোথায় ও বলুন আমাকে। সব কথা খুলে বলুন।'

যতই তাঁকে শান্ত হতে বলা হলো, হলেন না মিসেস চৌহান। বরং আরও বেশি অস্থির হয়ে উঠলেন। আবেগ উথলে উঠতে লাগল আরও বেশি করে। 'আমার অরুণ কতটা বড় হয়েছে? দেখতে কেমন হয়েছে?'

কিশোর বলল, 'খুব সুন্দর। আপনার সঙ্গে চেহারার অনেক মিল। আমাদের সঙ্গে যখন দেখা হলো, গাছের নিচে বসে ছবি আঁকছিল। তারমানে মায়ের গুণটাই পেয়েছে সে।'

'ওহ,' দুই হাতের তালু চেপে ধরলেন মিসেস চৌহান। আবেগে ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন একেবারে। 'কি যে ভাল লাগছে আমার! কি খুশি যে লাগছে, বলে বোঝাতে পারব না।'

কাজল জানাল, অরুণকে এ বাড়ির সীমানাতেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। 'আমাদের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে নাকি সাংঘাতিক মার মেরেছে ওকে তার চাচা হারুণ চৌহান। সব সময়ই মারে। নানা ভাবে অত্যাচার করে। সইতে না পেরে পালিয়ে চলে এসেছিল এদিকে। আমাদের কর্মচারী আবদুল ওহাব তাকে বনের মধ্যে দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে আসে। হারুণের ভয়ে তার ওখানেই ওকে লুকিয়ে রেখেছি আমরা।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস চৌহান। 'কোথায় আমার সোনামণি?'

এ সময় ঘরে ঢুকলেন খান সাহেব। তিনি তো অবাক। কাজলকে বললেন, 'ইনি যে এখানে, তোরা তো আমাকে বলিসনি এ কথা!'

'বলার সময়ই পাইনি,' কাজল বলল। 'তুমি তো সেই সকাল থেকে গায়েব। তা ছাড়া কিশোর বলল, আঙ্কেল সহ সবাইকে চমকে দিলে কেমন হয়? আমি বললাম, ভাল।'

'অ, এই কাণ্ড! তা সত্যিই চমকে দিয়েছিস বটে,' খান সাহেব বললেন। 'মিসেস চৌহান, আপনি বসুন। আমি ওকে নিয়ে আসতে লোক পাঠাচ্ছি।'

বেরিয়ে গেলেন খান সাহেব। ফিরে এলেন মিনিটখানেকের মধ্যেই। শুনলেন,

মিসেস চৌহান বলছেন, 'ভয়ানক নিষ্ঠুর আর শয়তান লোক অরুণের চাচা হারুণ। জঘন্য খারাপ! অরুণের বাবা কিরণের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। বিয়ের পর থেকেই আমার ওপর কুনজর ছিল হারুণের। আমার স্বামী তার আপন ভাই। তার সঙ্গে আমাকে দেখলেও সইতে পারত না সে। ভীষণ খেপে যেত। আমাকে একদিন বলেওছিল, সুযোগ পেলেই ভাইকে খুন করবে সে। কিন্তু খুন আর তার করা লাগেনি। কপাল খারাপ কিরণের। জরুরী ব্যবসার কাজে নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার সময় তার নৌকায় গুঁতো মারে একটা স্টীমার। মারা যায় কিরণ।' গলা ধরে এল মিসেস চৌহানের। রুমাল বের করে চোখ মুছলেন।

সহানুভূতি জানিয়ে বিড়বিড় করে কি বলল মুসা, বোঝা গেল না।

'সরি!' সামলে নিয়ে মিসেস চৌহান বললেন, 'আমার পিছে লাগল তখন হারুণ। আমাকে বিয়ে করতে চাইল। কোনভাবেই যখন রাজি করাতে পারল না, প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে অরুণকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল একদিন। আলমারিতে অনেক টাকা ছিল। সেগুলোও নিয়ে গেল। তারপর থেকে কত খোঁজা যে খুঁজেছি, কোন হদিসই পাইনি ওদের।'

আবার চোখে পানি দেখা দিল তাঁর। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে বললেন, 'দশ বছর পর এতদিনে খোদা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।'

চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল সবাই। ঘরে পিনপতন নীরবতা।

'স্বামীর মৃত্যুর পর একদিন আমার মনে হলো, ছবি এঁকে ধরে রাখব পুরো কাহিনীটা,' আবার বলতে লাগলেন মিসেস চৌহান। 'পার্চমেন্টে চারটা ছবি আঁকলাম। শয়তান হারুণ ওই ছবিটাও চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'ওটা নাকি দেখুন তো?' দেয়ালে ঝোলানো ছবিটার দিকে হাত তুলল কাজল।

পেছন দিয়ে বসেছিলেন বলে এতক্ষণ চোখ পড়েনি মিসেস চৌহানের। চিৎকার করে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই তো! তোমরা কোথায় পেলে?'

জানানো হলো তাঁকে।

কথাবার্তা বলে কিশোর নিশ্চিত হলো সু চি চৌহানই অরুণের মা। ছদ্মবেশী নন।

খান সাহেবের দিকে তাকালেন মিসেস চৌহান। 'কোথায় ও? আসছে না কেন?'

'তাই তো!' খান সাহেব বললেন। 'এত দেরি করছে কেন?'

'কিছু ঘটেনি তো?' বলে উঠল রবিন।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস চৌহান। 'চলুন চলুন! কোথায় রেখেছেন ওকে!'

আর ঠেকানো গেল না মিসেস চৌহানকে। দরজার দিকে ছুটলেন তিনি। সবাই চলল তাঁর পেছনে।

আবদুল ওহাবের ঝুপড়িতে যাওয়ার পথে অরুণকে আসতে দেখবে আশা করেছিল ওরা, কিন্তু দেখল না। আশঙ্কাটা বেড়ে গেল কিশোরের। দৌড় দিল ঝুপড়ির দিকে।

ওখানে পৌঁছে দেখা গেল সত্যিই অঘটন। মাটিতে পড়ে আছে আবদুল ওহাব। হাত-পা বাঁধা। অরুণকে নিয়ে যেতে যে লোকটাকে পাঠিয়েছিলেন খান সাহেব, সে-ও পড়ে আছে একটু দূরে। নিশ্চয় মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলা হয়েছে তাকে।

অরুণ কোথায়!

কোথায় অরুণ!

চারপাশে তাকাতে শুরু করল সবাই। সবার আগে তাকে দেখতে পেল মুসা। দু'জন লোক অরুণকে টানতে টানতে নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে বনের ভেতর।

'ওই যে! ওরাই মনে হয়!' চিৎকার করে উঠে দৌড় দিল মুসা।

বাকি সবাই ছুটল তার পেছন পেছন।

এত লোক দেখে ভড়কে গেল লোকগুলো। বুঝতে পারল, অরুণকে নিয়ে পালাতে পারবে না ওরা। বরং নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ধরা পড়বে। ওকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়াতে লাগল ওরা।

তাড়া করে গেল তিন গোয়েন্দা আর কাজল। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে খামারের শ্রমিকদের ডাকতে লাগলেন খান সাহেব।

বন থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা গাড়িতে উঠল লোকগুলো। কিন্তু ওদের কপাল খারাপ, স্টার্ট নিল না গাড়ি। আবার নেমে দৌড় দিতে যাবে, পৌঁছে গেল গোয়েন্দারা। হাত চেপে ধরল। চারজনের বিরুদ্ধে দু'জন, আপ্রাণ চেষ্টা করেও ছুটতে পারল না লোকগুলো। খামারের লোকজন এসে পড়ায় পরাস্ত হতে বাধ্য হলো ওরা। ধরা পড়ল। খামারের শ্রমিকদের হাতে দু'চারটা চড়-থাপ্পড় খেয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, হারুণ চৌহানই ওদেরকে খামারে অরুণের খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিল।

দুই অপরাধীকে সহ গোয়েন্দারা ফিরে এসে দেখে অরুণের কাছে পৌঁছে গেছে বাকি সবাই। মিসেস চৌহানকে দেখিয়ে কাজল বলল, 'অরুণ, তোমার মা।'

চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইল অরুণ। বিশ্বাস করতে পারছে না।

মিসেস চৌহান, 'অরুণ! অরুণ!' বলে চিৎকার করতে করতে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে।

অরুণের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। চুপ করে রইল সে। সত্যিই তার মা কিনা বিশ্বাস হচ্ছে না যেন তার। ভাবছে, চালাকি করে কাউকে পাঠিয়েছে হারুণ।

অনেক কথা বলে, বুঝিয়ে-টুঝিয়ে শেষে মিসেস চৌহান ওকে বিশ্বাস করাতে

পারলেন যে তিনিই ওর মা।

দুই অপরাধীর স্বীকারোক্তি আর অরুণের সাক্ষীতে হারুণ চৌহানকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। আরও নানা রকম চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেল হারুণ ও তার বাড়ির লোকজনকে জেরা করে।

ভীষণ কুটিল আর লোভী লোক হারুণ চৌহান। তার খামারে যতজন বার্মিজ আছে, সবাই অপরাধী। বার্মিজ পুলিশ খুঁজছে ওদের। হারুণের সহায়তায় সবাই অবৈধ পথে বাংলাদেশে ঢুকেছে। হারুণ ওদের আশ্রয় দিয়ে ওদের দুর্বলতার সুযোগে শুধু খাবার আর থাকার জায়গা দেয়ার বিনিময়ে যথেচ্ছ খাটিয়ে নিচ্ছে ওদের।

আরও শয়তানি করেছে হারুণ। আশেপাশের স্থানীয় গৃহস্থ আর ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 'কৃষক-শ্রমিক' সমিতি করার নামে প্রচুর টাকা হাতিয়েছে। তাদেরকে বুঝিয়েছে, অনেক বড় ব্যবসার অংশীদার করে নেয়া হবে ওদের। অনেক লাভ। হারুণের এ সব কাজ করার জন্যে দালাল আছে। সবগুলো সন্ত্রাসী। আবদুল ওহাবের কাছে এ রকম দু'জন দালালই গিয়েছিল। তাকে সমিতির সদস্য হওয়ার প্রস্তাব দিতে। বাজারের দোকানদার মিরণ পোদ্দারের কাছেও এই প্রস্তাব নিয়েই দালালরা গিয়েছিল। ওদের উদ্দেশ্য ভাল না বুঝতে পেরে, প্রস্তাবে রাজি হয়নি মিরণ। ওহাব আর মিরণ দু'জনে মুখ খোলেনি সন্ত্রাসীদের ভয়েতেই, ওদের পরিচয় দিতে রাজি হয়নি।

সব রহস্যেরই সমাধান মিলল। চুরি করা ছবিটাও পাওয়া গেল হারুণের বাড়িতে। তার নিজের ড্রয়ারে। লোক পাঠিয়ে সে-ই চুরি করিয়েছিল। প্রমাণ হিসেবে সেটা জব্দ করল পুলিশ।

শেষ যে রহস্যটা খুঁতখুঁত করছিল কিশোর আর কাজলের মনে—অদ্ভুত সেই পাখি—তার জবাবও পাওয়া গেল। যান্ত্রিক পাখি ওগুলো। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মানুষ প্রহরী রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি হারুণ চৌহান। তাই ওই পাখির ব্যবস্থা করেছিল। হংকঙের এক খেলনা কোম্পানিকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে এনেছিল ওগুলো। তার বিনা অনুমতিতে কেউ বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলেই রিমোট টিপে ওই পাখি লেলিয়ে দিত। যতক্ষণ আবার রিমোট টিপে পাখিগুলোকে থামানো না হয়, ততক্ষণ একনাগাড়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করেই যায় ওই যান্ত্রিক পাখি।

'বাপরে! জিনিস বটে একখান ওই হারুণ চৌহান!' মন্তব্য না করে পারল না মুসা। 'চিরকাল শুনে এসেছি, মানুষ কুকুর পোষে চোর তাড়ানোর জন্যে। কিন্তু গোয়েন্দা তাড়ানোর জন্যে যে কেউ যান্ত্রিক পাখি পোষে জীবনে এই প্রথম শুনলাম!'

***